# ভুলি নাই

শ্রীমনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল পাব্লিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মানসী প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫০; দ্বিতীয় মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৫০;
তৃতীয় মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৫১; চতুর্থ মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৫১;
পঞ্চম মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৫২।

**ষষ্ঠ মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫২**

**মূল্য দুই টাকা**

প্রারম্ভ-কবিতাটি শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের লেখা

শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস
বন্ধুবরেষু

—এই লেখকের অন্যান্য বই—

**সৈনিক** ( ২য় সংস্করণ )
রাজনৈতিক উপন্যাস

*

**দুঃখ-নিশার শেষে** ( ২য় সংস্করণ )
সর্বাধুনিক গল্প-গ্রন্থন

*

**একদা নিশীথকালে** ( ২য় সংস্করণ )
হাস্যমধুর সচিত্র গল্প-স্তবক

**নূতন প্রভাত** ( ৩য় সংস্করণ )
বাংলার প্রথম প্রগতি-নাট্য

**পৃথিবী কাদের?** ( ২য় সংস্করণ )
নবযুগের সমস্যাসঙ্কুল গল্প-প্রচয়

*

**প্লাবন** ( ২য় সংস্করণ )
নাট্যভারতীতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক

*

**নরবাঁধ** ( ৩য় সংস্করণ )
সেকাল ও একালের অতুলন আলেখ্য

*

**বনমর্ম্মর** ( ৩য় সংস্করণ )
বাংলা-সাহিত্যের স্মরণীয় গল্প-গুচ্ছ

*

ওগো বধূ সুন্দরী
স্নিগ্ধ-মধুর প্রেমোপাখ্যান

# ভুলি নাই

"যাঁহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি' বিক্ষুব্ধ ধূলায়
উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায়া জননীর করিল তর্পণ,
মানবের মহালোভ, বাঁচিবার লোভ যারা ত্যজিল হেলায়,
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জ্জন।
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহুলক্ষ পরাধীন আশাহীন জনে
পথ-কুক্কুরের মতো পথে পথে তাড়া খেয়ে ফিরি দীর্ঘদিন,
কেহ বা বরিল কারা, কেহ মৃত্যু মহোল্লাসে প্রেম-আলিঙ্গনে—
স্বেচ্ছাবৃত অপঘাতে জীবনের সর্ব্বআশা করিল বিলীন।
ক্লেদপঙ্ক-সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোক-বার্ত্তাবহ,
তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারাবার,
ওরে হতভাগ্য দেশ, শ্রদ্ধা ভরে তাহাদের পুণ্যনাম লহ—
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার।"

কুন্তল-দা, তোমাদের ভুলি নি। পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে নিরুদ্বিগ্ন মানুষগুলোকে দেখি, খাচ্ছেদাচ্ছে, অফিস করছে, রোগে ভুগে নির্বিবাদে মরে যাচ্ছে। দিব্যি আছে। আমিও ওদের একজন হয়ে থাকব, মল্লিকার মুখ চেয়ে কতবার ঠিক করেছি। কিন্তু পারি কই? নিঃশব্দ রাত্রে তোমরা এসে হাজির হও, ফিস-ফিস কথাবার্তা···আমার পাতানো বউ নিরু হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ায়···অভিমানাহত আনন্দ আসে... স্তব্ধমূর্তি সোমনাথের ছায়া দেখে তাড়াতাড়ি যুক্তকরে প্রণাম করি··· জগৎ দত্ত, উমারাণী, মায়া, সরোজ পাকড়াশি—জানা অজানা কত সাথী যেন যুগান্তের ঘুম ভেঙে উঠে আসেন।

ভুলবার জো আছে তোমাদের?

আমার বাপ হলেন নীলকান্ত রায়। অমন ডাকসাইটে প্রিন্সিপ্যাল তখনকার দিনে কোন মফস্বল কলেজে ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়, আমি তখন ছেলেমানুষ। মনে পড়ে, সেদিন রাখিবন্ধন—কোন বাড়ি রান্না হয় নি, অরন্ধন-ব্রত পালিত হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় ছেলে-বুড়ো স্বদেশি গান করছে, এ ওকে হলদে রাখি পরিয়ে দিচ্ছে। আমরা কলেজ-সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকি। গোলমাল হবে মনে করে মা ইস্কুলে যেতে দেন নি, স্ফূর্তির তাই অবধি নেই। হঠাৎ শতকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠল; ছুটে সদর-দরজায় গেলাম।

প্রকাণ্ড মিছিল করে ছেলেরা বেরিয়ে যাচ্ছে। আচম্বিতে বাধা পড়ল, বাবা অফিস-ঘরের বারান্দায় এসে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন; কুন্তল, শোন এদিকে—

সাড়ে চার-শ ছেলের মধ্যে কারও ক্ষমতা ছিল না, এ ডাক অমান্য করতে পারে। সেই আমি প্রথম দেখলাম কুন্তল-দাকে। বারান্দায় উঠে বাবাকে প্রণাম করে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়ালেন। আমার বুক ঢিব-ঢিব করছিল, কি যে আছে ওঁর অদৃষ্টে! আজও স্পষ্ট মনে আছে সে ছবিটা।

ছাত্রের এরকম বলিষ্ঠ ভঙ্গির সঙ্গে—বাবা বলে নয়, কলেজ-সম্পর্কিত কেউ কোন দিন পরিচিত নন। ভ্রূকুঞ্চিত করে বাবা বললেন, ব্যাপার কি কুন্তল ?

আপনার কলেজ ভেঙে নিয়ে যাব বলে এসেছি। বন্দেমাতরম্ বলতে দেবে না, সার্কুলার দিয়েছে। প্রাণে এ অপমান সইছে না।

সকলে হতবাক্। এই ভয়লেশহীন ছেলেটার মাথায় বজ্রপাত হল বলে—দু-এক ঘণ্টায় হোক বা দু-এক দিনের মধ্যে হোক—কারও এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রইল না। আর একটা কথাও না বলে বাবা নিজের ঘরে চলে গেলেন। গণ্ডগোল ও চিৎকার অতঃপর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, অনেক ছেলে সুড়-সুড় করে ক্লাসে ঢুকল। অবশিষ্ট বোধ করি জন পঞ্চাশ নিয়ে কুন্তল-দা দৃঢ়পদে বেরিয়ে গেলেন। কলেজ-সীমানার বাইরে অনেক রাত্রি অবধি সভা বসল, মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল।

পরদিন অভাবিত ব্যাপার—দেখি, আমাদের বৈঠকখানায় কুন্তল-দা এসে বসেছেন। আর পাঁচ-সাত জন বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। সে সব কথার কিছু মনে নেই, মনে রাখবার বয়সও তখন আমার নয়। নানা ছুতোয় আমি ঘরের মধ্যে এসে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় ঐ প্রদীপ্ত-মুখ কিশোরটিকে বারম্বার চেয়ে দেখছিলাম। শেষ কথাটি মনে আছে, বাবা বলছেন, বড় কঠিন পথ—পারবে তোমরা ?

পারব মাস্টার মশাই, আপনি আশীর্বাদ করুন।

একজনও যদি ফিরে এস, আমাকে আর পাবে না তোমাদের মধ্যে।

কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন স্থানীয় সরকারি উকিল। তিনি খুব

সহানুভূতি দেখিয়ে বাবাকে বললেন, আপনার মানা না শুনে বেরিয়ে গেল? বড় অন্যায় কথা—

বাবা বললেন, মানা আমি করি নি। ব্যাপারটা শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, যাই হোক—মোটের উপর ঐ একই দাঁড়াল। দলের চাঁই ক'টার নাম লিখে দিন তো—

কাকে ফেলে কার নাম লিখি, মশায়? ভীতু দু-চারটে হয়তো ক্লাসে গিয়েছিল, কিন্তু মনে মনে তারাও ঐ দলের। আর সত্যি বলতে কি— আপনার আমারই কি কম বেজেছে? নেহাৎ বুড়ো হয়ে পড়েছি বলে চেঁচাই নে—

সেক্রেটারি মুখ লাল করে বললেন; কলেজে ছেলে না থাকায় আপনি খুশি হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।

ছেলে নেই বলে আমার এদ্দিনের গোলামি খসে গেল, এর জন্যে সত্যি খুশি হওয়া উচিত। এতগুলো টাকার মায়া নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করা মুশকিল হয়ে পড়ত।

এক কথায় বাবা চাকরি ছাড়লেন; শপথ ভেঙে ছেলেরা ফিরে আসে কিনা দেখবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন না। স্ট্রাইক অবশ্য বেশিদিন টেঁকে নি, প্রায় সবাই কলেজে ফিরে এসেছিল—কুন্তল-দা পর্যন্ত। কিন্তু আর একটা পথে যে ঐ সঙ্গে যাত্রা শুরু হয়ে গেল, জীবনান্ত অবধি কারও ওঁদের ফিরে তাকাবার ফুরসৎ হল না।

জেলার কালেক্টর পর্যন্ত হাতে ধরে বাবাকে অনুরোধ করলেন, তিনি শুনলেন না। বাড়ির মধ্যেও তুমুল ঝড় উঠল। বাবা হাসিমুখে সকলকে নিরস্ত করতেন। বলতেন, আমার ছেলেরা জীবন দিচ্ছে—আর মাস মাস নগদ তঙ্কা গুণে নিয়ে কি করে আমি রাজভোগে থাকি বল।

সব জায়গায় এমনই এত খাতির, তার উপর চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে বাবা দেবতাবিশেষ হয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে স্বদেশি সভা সেইখানেই তাঁকে যেতে হয়। নিতান্ত অপারগ হয়ে দু-এক ক্ষেত্রে যদি 'না' বলেছেন, পা জড়িয়ে ধরে একরকম জবরদস্তি করে পালকিতে তুলে নিজেরা তাঁকে বয়ে নিয়ে যেত। বস্তুত ছেলেরা একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল। কুন্তল-দা প্রভৃতিকে ভীষণ রকম শাস্তি দেবার জন্য কল্পনা-জল্পনা হচ্ছিল, গতিক দেখে সেসব স্থগিত রইল। সেক্রেটারি একদিন কুন্তল-দাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি না যাওয়ায় শেষকালে উকিল বাবু নিজেই নাকি খুব গোপনে তাঁর হস্টেল-ঘরে আসেন। এ কথা কুন্তল-দার কাছে শোনা—অতএব মিথ্যা হতে পারে না। শুভার্থী অভিভাবকের মতো স্নেহের সুরে তিনি বলেছিলেন, তোমরা রাজনীতি করতে যাচ্ছ, অন্যায় কিছু নয়, কিন্তু তার একটা কালাকাল আছে তো! এখন শিক্ষার সময়, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। বয়স হলে রাজনীতি কোরো—

কুন্তল-দা জবাব দিলেন, আপনার রাজনীতি আর আমার রাজনীতি একেবারে আলাদা সুর। আপনার রাজনীতির মানে টাকাকড়ি, মোটরগাড়ি, সরকারি খেতাব, সাহেবসুবোর কাছে প্রতিপত্তি, কাউন্সিলের মেম্বর হওয়া—আর আমাদের রাজনীতি হল অন্ধকার জেল, বেত খাওয়া, আপনার জনের সঙ্গ থেকে চিরবঞ্চনা, দ্বীপান্তর, হয়তো বা ফাঁসের দড়ি। আপনার ঐ বয়স অবধি টিঁকে থাকা কপালে নেই। যদি থাকি, তখন হয়তো আপনাদের রাজনীতিই করব।

বিপাকে পড়ে এমন কথাও উকিলবাবু হজম করে নিলেন। কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। কলেজের খাতায় যথারীতি কুন্তল-দার নাম রইল। পড়াশুনোর সময় নেই, সে ইচ্ছেও নেই—তবু নিতান্ত কাজের গরজে

কলেজের আওতায় পড়ে থাকা। নূতন বছরে নূতন নূতন ছেলেরা আসে, দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে কুন্তল-দার সম্পর্কে সম্ভব অসম্ভব নানা কাহিনী ছড়িয়ে যায়,—তাঁর কাছে যাবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য, দু-এক ছত্র লেখা চিঠি পাবার জন্য সকলে ব্যগ্র। নূতন এক প্রিন্সিপ্যাল এলেন, কুন্তল-দাকে ঘাঁটাতে তিনি সাহস করতেন না—ছেলেদের সর্বদা কড়া শাসনে রাখতেন, যেন তারা লেখাপড়ায় অধিক মন-সংযোগ করে, আড্ডা দিয়ে না বেড়ায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রকারান্তরে কুন্তল-দার সঙ্গে মিশতে মানা করে দেওয়া আর কি!

তখন কুন্তল-দা হস্টেল ছেড়ে কাছাকাছি এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে বাসা নিলেন, ছেলেদের যাতে অসুবিধা না ঘটে। একবার বমালসুদ্ধ ধরা পড়লেন। জেল হল। ঐ সঙ্গে কলেজ থেকেও নাম কাটা গেল।

সেই প্রথম ধরা পড়ে তিনি এক কীর্তি করেছিলেন, শুনেছি। পরবর্তী কালে ঐ প্রসঙ্গ উঠলে কুন্তল-দা হাসতেন, আর যাঃ—বলে আমাদের তাড়া দিতেন। তাঁকে হাজতে আটকে রেখেছিল। সারারাত্রি তিনি দেয়ালে মাথা কুটেছিলেন। সকালে দেখা গেল, রক্তারক্তি ব্যাপার। বৃত্তান্ত কি? তিনি কানে শুনেছেন, কর্তাদের নাকি নানা রকম মিষ্টি ও তেতো ব্যবস্থা আছে—যার জন্য এর আগে অনেক ছেলে দলের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। সে যে কি ব্যাপার, কোন আন্দাজ ছিল না—পাছে তিনিও ঐরকম ফাঁদে আটকা পড়েন, তাই কুন্তল-দা মরতে চেয়েছিলেন।…

স্বীকারোক্তি কথায় মনে পড়ে, আমাদের সরোজ পাকড়াশির কথা। গুলি-বেঁধা অবস্থায় সে ধরা পড়ে। প্রশ্ন হল, কি জান তুমি? দিনের পর দিন দলবদ্ধ হয়ে এস তাকে উত্যক্ত করে, বল, তুমি কি জান—

অবশেষে একদিন সরোজ বলল, শুনবেন না দেখবেন?

ওরা এ ওর মুখে তাকায়।

দেখুন তবে—। শ্লথ হাত দু'খানা সরোজ বুকের উপর আনল। হয়তো কোন গোপন চিঠিপত্র আছে—নিশ্বাস নিরুদ্ধ করে ওরা প্রতীক্ষা করছে। কি? ওকি? একটানে সরোজ ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলল। রক্ত তীরবেগে ছুটেছে। সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল, চেতনা আর ফেরে নি।

ঐ সরোজের মা—কি হিংস্র মেয়েমানুষ! সরোজের মা বলে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত, মাথায় থাকুন তিনি—কিন্তু মোটেই সুবিধের লোক ছিলেন না, আমাদের যেন দাঁতে পিশে ফেলতে চাইতেন, অহরহ আঙুল মটকে বন্দেমাতরম্-ওয়ালাদের উদ্দেশে গালি পাড়তেন, চেঁচামেচি করে একদিন হিরণকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আর কি! অথচ তাঁর দুটি ছেলে মেয়ে এই পথের পথিক হয়ে গেল, অত সতর্ক থেকেও মা-ঠাকরুণ ঘরের আগুন সামলাতে পারলেন না।...

শান্তিদিদির কথা মনে পড়ে। তাঁর স্বামী পুলিসের মধ্যে নামজাদা লোক; এদিকেও অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র। তাঁরই বিশ্বাসপ্রবণতার দরুন আমাদের হিরণ পালাবার সুবিধা পেয়েছিল। তাকে ধরার জন্য ভদ্রলোক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিলেন; নারায়ণতলায় গিয়ে শান্তি-দিদিকে সেই সময়ে গোপনে বলতে শুনেছি, ধরলে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেবে ঠাকুর, যেন ধরা না পড়ে।

তোমার বরের চাকরি থাকবে না তা হলে—

শান্তিদিদি বললেন, একবেলা আধপেটা খেয়ে থাকব ভাই।...

আবার কুন্তল-দার মাকে দেখেছি, আমাদের দলসুদ্ধ সকলের মা। ছেলে চোখের সামনে তিলে তিলে মারা গেল, মায়ের মুখের স্নিগ্ধ-হাসি

কোনদিন নিষ্প্রভ হতে দেখলাম না। বরঞ্চ স্বরমাই এসে এক একদিন রাগারাগি করত, মাকে বলত, আপনি পাষাণ—

আমরা অনেকেই সেখানে বসে, স্বরমা বলেছিল, নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছেন কুন্তল-দা, সেখানে সবাই সুখী—সবাই ভোগী। কিন্তু আপনি নিজে কি ভোগ করে গেলেন, বলুন তো—

কুন্তল-দা চাপা মানুষ; কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেদিন কি হল—যেন মনের দরজা খুলে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, এর জন্য আমারও কষ্ট হয় বোন। অনেকের অনেকদিন জমানো অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হল আমাদের উপর দিয়ে। সংসার আমার জন্য নয়—শান্তি বল, সুখ বল, কিছুই আমি নিলাম না—পথে পথে ভেসে গেলাম। এই ভেসে-যাওয়ার বদলে তোমাদের লক্ষ লক্ষ সংসার যেন আনন্দে ভরে ওঠে। নইলে বৃথাই আমাদের আত্মবঞ্চনা।···

শোন আর একটা গল্প। জেলে ছিলাম সে সময়টা। ভোরবেলা মিষ্টি রিনরিনে কণ্ঠ শুনতে পেলাম, যাচ্ছি দাদা, আপনারা দোয়া করুন। আর একজন বলছে, নমস্কার—ভুলবেন না। স্বাধীন দেশে আবার আমরা জন্মাব।

দুই বন্ধু তারা, এর আগে চোখে চোখে তাদের সঙ্গে আলাপ করে-ছিলাম। দু'জনে দৌড় দিল, কে আগে ফাঁসের দড়ি গলায় পরতে পারে!···

এদের দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতার আজ অপরূপ সংজ্ঞা পেয়েছি। পন্থাও নূতনতম। তবু কি ভুলতে পারি—ছবি হয়ে এরা মনের মধ্যে জ্বল-জ্বল করে। বুড়ো হয়েছি, তোমরা দাদা বলে ডাক; উৎসুক মুখে বল, আপনাদের সেই সব গল্প বলুন। ছাড়া-ছাড়া কাহিনী বলি, শুনে তোমাদের তৃপ্তি হয় না—আগাগোড়া একটানা শুনতে

চাও। কিন্তু বলি কি করে ভাই? প্রথম বয়সে স্বপ্ন নিয়ে পথে বেরিয়েছি, জীবন ভোর তো প্রতীক্ষায় রয়ে গেলাম, আসছে··· আসছে···আসছে···। দিন যখন আসবে, স্মৃতি যদি সে সময় একেবারে মরে না যায়, দস্তুরমতো আসর করে জাঁকিয়ে সকল কথা শোনাব। সবুর কর সে ক'টা দিন।

## রাণী

রাণীর অপমৃত্যু হয়েছে, এই আমরা জানতাম। হয়েছেও তাই। বলছি, শোন।

পুরী গিয়েছিলাম।

যাওয়ার কিছু ঠিক ছিল না, মেজমামাই যেতেন। তিনি রেলে কাজ করেন, পাস পেয়েছিলেন, হঠাৎ বাতের অসুখ বেড়ে শয্যাশায়ী হলেন। তখন আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, তুমি যাও শঙ্কর, পাসটা নষ্ট হবে কেন! রেলের কেউ জিজ্ঞাসা করলে স্রেফ আমার নাম বলে দিও, কে কাকে চেনে!···আর আমাদের রায়বাহাদুর রয়েছেন সেখানে, গিয়ে দেখা কোরো—কোন রকম অসুবিধা হবে না।

রায়বাহাদুর হলেন অনন্তপ্রসাদ চক্রবর্তী। তোমাদের মনে পড়বে কিনা জানি না, তাঁর বুড়ো বয়সে বিয়ে করা নিয়ে সেবারে খবরের কাগজে অনেক টীকা-টিপ্পনী হয়েছিল। ছেলেদের সঙ্গে ঐ নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়, এবং রায় বাহাদুরের সন্দেহ—ঐ লেখালেখির ব্যাপারে তাদের যোগসাজস ছিল। এখন অবশ্য সব মিটে গেছে। এক রকম সেই থেকেই রায়বাহাদুর নূতন বউ এবং আগের পক্ষের কচি ছেলে-মেয়েগুলো নিয়ে পুরীতে বাস করছেন। তাঁর এক ছেলে যতীশ্বর মেজমামার কলেজের বন্ধু—অভিন্নহৃদয় বললে হয়। এখন আবার এক

আপিসে কাজ করছেন। ওঁদের কলকাতার বাড়িতে মেজমামার আড্ডা।

পুরী পৌঁছলাম সকালবেলা। একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বিকালে রায়বাহাদুরের খোঁজে বেরিয়েছি। বহুকাল আছেন, অনেকেই চেনে দেখলাম। চক্রতীর্থের দিকে খানিকটা গিয়ে বাঁ-হাতি এক রাস্তা, সারি সারি বিস্তর ঝাউগাছ, তার মধ্যে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড-ওয়ালা দোতলা বাড়ি।

রায়বাহাদুর বাইরের ঘরে ছিলেন, বেরোবার তোড়জোড় হচ্ছিল। ইনভ্যালিড-চেয়ার এসেছে, দু-জন চাকর দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ছেলে-পুলের পাল। একটি মহিলাও ছিলেন—নিশ্চয় দ্বিতীয় পক্ষের সেই স্ত্রী। আমায় ঢুকতে দেখে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। চলে গেছেন—তবু দামি সেন্টের গন্ধে ঘর আমোদ করে রেখেছে। বুড়া বয়সের বউ কিনা! রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে আমার দিকে চাইলেন, অস্থিচর্মসার বিসদৃশ রকমের লম্বা মুখ। সাড়াশব্দ না দিয়ে এ রকম ভাবে ঢুকে পড়া উচিত হয় নি, বুঝতে পারলাম।

কি চাই তোমার ?

জবাব না দিয়ে যতীশ্বরবাবুর চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম।

চিঠি, খালি চিঠি…। বিড়-বিড় করে বকতে বকতে পকেট হাতড়ে তিনি চশমা বের করলেন। এক নজর পড়ে অবহেলার সঙ্গে ফেলে দিলেন। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি করতে হবে আমায় ?

কিছু না। বলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেরিয়ে এলাম। বড্ড রাগ হল, এ ধরনের মানুষগুলোই এই রকম! আমি কি চাকরি চাচ্ছি, না ওঁর বাড়িতে অন্নধ্বংস করবার মতলবে এসেছি? এমন জায়গায় মানুষে আসে, মেজমামার যেমন কাণ্ড!

আর ওমুখো যাই না। হোটেলেই শুয়ে বসে তাস খেলে কাটাই, সন্ধ্যার দিকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। স্বর্গদ্বারের ওদিকে যে জায়গাটাকে গৌরবাটসাহি বলে, সেখানে লোকজন বড় বেশি যায় না। আমি একদিন গিয়েছি সেদিকে। দেখি, বালির উপর চেয়ার পেতে রায়বাহাদুর বসে আছেন। আমি হন-হন করে এগিয়ে গেলাম, তাকালাম না। ফিরবার মুখে দেখলাম, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন—বাড়ি ফিরবার উদ্যোগ হচ্ছে।

এর পর মাঝে মাঝে ওদিকে যাই। ঐ একটা জায়গাতেই তাঁরা রোজ এসে বসেন। সেই আমলের খবরের কাগজে লিখেছিল—'একটি পরমা-সুন্দরী কিশোরী বৃদ্ধের লালসায় আত্মাহুতি দিল'···এমন কত কি! তাই মহিলাটিকে দেখবার খুব ঔৎসুক্য আছে, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘোর হয়ে গেলে তবে তিনি আসেন, সুবিধা হয় না। একদিন অবশেষে দেখে ফেললাম। গাড়ি রাস্তায় রেখে বালি ভেঙে তিনি আসছিলেন, একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। চমকে উঠলাম। এ মুখ যে আমার চেনা,—খুব চেনা বলে মনে হচ্ছে। অথচ ধরতে পারছি না, মনে পড়ে না,—যেন পূর্বজন্মের পরিচিত কেউ, এ জন্মের নয়। মহিলাটিরও আমার দিকে নজর পড়ল, তাড়তাড়ি মাথায় আঁচল টেনে মুখ ফিরিয়ে তিনি চলে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে লাগলাম। তার পর মনে হল, রাণীর মুখের সঙ্গে এঁর আশ্চর্য মিল। কিন্তু রাণী কি করে হবে? রাণীর অপমৃত্যু হয়েছে, সে জলে ডুবে মরেছে, পুলিশের রিপোর্টেও একথা আছে। তার সম্বন্ধে সকল কৌতূহলের অবসান হয়ে গেছে।

আলো নিবিয়ে শুয়েছি, ঘর অন্ধকার। হঠাৎ অন্ধকারের পর্দা উঠে

যায়···কাল পিছুতে পিছুতে বছর-তিরিশ পিছিয়ে গেল। সেই যখন আমরা থাকতাম হস্টেলে। হস্টেল মানে গোলপাতার ঘর, মাটির মেঝে। শীতকালে মাটিতে শুতাম, বর্ষার সময় বাঁশের মাচা তৈরি করে নেওয়া হত—ঠাণ্ডার জন্য নয়, পিছনের জঙ্গল থেকে রাত্রিবেলা সাপ উঠত, সেই আশঙ্কায়। কুন্তল-দা ফোর্থ ইয়ারে পড়তেন—কি রকম 'পড়তেন' সে তো আগেই শুনেছ ভাই। ফোর্থ ইয়ারের খাতায় নাম ছিল, কয়েক বছর ধরেই ছিল। তাঁর বাড়ি থেকে টাকা আসত হস্টেলের ঠিকানায়, কিন্তু তখন তিনি হস্টেল ছেড়েছেন। ওখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে দ্বারিক চাটুজ্জে নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে খাওয়া-থাকা পান। বাড়ির লোক জানত, হস্টেলে আছেন, তাঁরা তদনুযায়ী টাকা পাঠাত; সে টাকা দিয়ে কুন্তল-দা···না, যাকগে সেকথা। তখন আমার আশ্চর্য লাগত, দুঃখও হত। কত কষ্ট যে করতেন কুন্তল-দা! দ্বারিক চাটুজ্জের অবস্থা সুবিধের নয়—চাকর-বাকর ছিল না, খাওয়ার পর কুন্তল-দাকে এঁটো পাড়তে হত, বাসন মাজতে হত। আর সে কি খাওয়া! সমস্ত বসন্তকাল ধরে চলত সজনের খাড়া, তার পরেই কাঁঠালবিচি আর নটের ডাঁটা একেবারে আশ্বিন অবধি।

কলেজের পর আমরা প্রায়ই যেতাম কুন্তল-দার ওখানে; রবিবারের দিন তো নিশ্চয়ই। রাণী অর্থাৎ উমারাণীর সঙ্গে চেনাশোনা সেখানেই, সে ঐ বাড়ির মেয়ে। বয়স আঠার-উনিশ—তবু বিয়ে হয় নি। ওঁরা কুলীন, পালটি ঘর খোঁজ করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। আর সে রকম টাকা-পয়সা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

রবিবারে রবিবারে সেখানে নানা রকম বই পড়া হত—গীতা, আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ ও দেউস্করের বই—এই সমস্ত। কুন্তল-দার

হুকুম ছিল, প্রত্যেক দিনই সবাইকে গীতা পড়তে হবে। যার যেখানে খট্‌কা লাগত, দাগ দিয়ে রেখে দিত; রবিবারের দিন কুন্তল-দা তার মানে বুঝিয়ে দিতেন—একেবারে নিজের মতো করে, ছাপানো বাংলা ব্যাখ্যার সঙ্গে তা মেলে না। এই সব পড়াশুনার মধ্যে আমরা এক এক দিন দেখতাম—কুন্তল-দাও দেখেছেন নিশ্চয়—রাণী কামরার মধ্যে বসে তদ্গত হয়ে শুনছে, তার যেন সম্বিত নেই। সে ছবি আজও মনে করতে পারি। মনে রেখ, সেটা পাড়াগাঁ জায়গা, আর রাণীরাও কিছু বড়লোক নয়—সেজন্য পর্দার কড়াকড়ি ছিল না, সহজ ভাবেই সে আমাদের সঙ্গে মিশত। একেবারে বাড়ির গায়ে ভৈরব নদী, মাঝে মাঝে আমরা নদীর ঘাটে গিয়ে বসতাম। তখন লক্ষ্য করেছি, রাণী জল-আনা কাপড়-কাচা এই রকম নানা ছুতো করে বার-বার সেখানে আসা-যাওয়া করত।

বর্ষার সময়টা একদিন সকাল থেকে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আমার এ রকম হয়েছিল, কলেজ না থাকলে দুপুরবেলাটা হস্টেলে বসে কিছুতে সোয়াস্তি পেতাম না। ভিজতে ভিজতে গিয়ে উঠলাম সেই চালাঘরখানায়, যেখানে কুন্তল-দার অনন্তশয্যা বারো মাস তিরিশ দিন পাতাই থাকত। একে মেঘলা দিন, তার উপর সে ঘরে জানলার হাঙ্গামা না থাকায় ভিতরটা আঁধার-আঁধার হয়ে ছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমটা শুধু কুন্তল-দাকে দেখতে পেলাম—খুব গম্ভীর হয়ে বিছানার উপর বসে আছেন। তারপর অবাক হয়ে গেলাম—এ রকমটা আর কোন দিন হয় নি দেখি, বেঞ্চের উপর মুখ নিচু করে বসে রয়েছে রাণী, দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। কুন্তল-দা বললেন, এই যে শঙ্কর এসে গেছিস। ভালো হয়েছে, বোস। পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। বসতেই আমার ডান হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিলেন।

চুপচাপ, কোন কথাবার্তা নেই—তিনি বিচলিত হয়েছেন বুঝতে পারছি।

এমন অবস্থায় আমি যে কি করব, বুঝতে পারি নে—কাকে কি বলব! একটু পরে কুন্তল-দা বললেন, আচ্ছা—শঙ্করই বলুক, তোমাকে দিয়ে আমাদের কি কাজ হবে? আমি তো ভেবে পাই নে। তুমি মিথ্যে দুঃখ করছ রাণী।

উমারাণী কান্নার স্বরে বলে, আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই বলুন। ভাবছেন, আমাকে দলে নিলে দেশের কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

কুন্তল-দা আমার দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা এক পাগল! একটু বুঝিয়ে দে তো শঙ্কর।

আবার নিজেই বোঝাতে লাগলেন, দেশ মানে কি খানিকটা মাটি আর দুটো গাছপালা? দেশ হচ্ছে তোমরা সকলে মিলে। স্বাধীন দেশে তোমরা স্বচ্ছন্দে থাকবে, তাই আমরা খেটে মরছি। বিনা লাভে কেউ কখনো কষ্ট করে···বল, তুমিই বল। তার চেয়ে শোন—যখন ছেলেপুলে হবে, একটা-দুটো আমাদের দিও। দেশ-উদ্ধার তো এক দিনে হয়ে যাচ্ছে না।

রাণী তর্ক করে, আর তোমরা? তোমরা বুঝি দেশের মানুষ নও কুন্তল-দা? তোমরা যে না খেয়ে দেয়ে জীবনের মায়া না করে এই রকম ভাবে বেড়াচ্ছ—

কুন্তল-দা হো-হো করে হেসে কথা উড়িয়ে দিলেন। বললেন, দেখ একবার। এইজন্য তোমাদের নিতে চাই না। তোমরা এলে মহা আয়োজনে খাওয়াতে বসে যাবে, জীবনের সম্বন্ধে যাতে মায়া করি তার সদুপদেশ ছাড়বে। ঐ সব বুঝেই স্বামীজি কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন।

দেয়ালে বিবেকানন্দের ছবি, পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া পাগড়ি—বীরমূর্তি! কুন্তল-দা সেই দিকে হাস্যমুখে চেয়ে রইলেন। আমাকে বললেন, আর যে কাউকে দেখছি নে। বিষ্টি-বাদলায় সাহেবদের 'পরে রাগ হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল নাকি?

উমারাণী এই সময়ে কথা বলে উঠল। বলে, আমি আপনাকে একটা প্রণাম করব কুন্তল-দা? তাতেও কি আপত্তি আছে?

কুন্তল-দা যেন চমকে উঠলেন। আমার দিকে চেয়ে সহজ ভাবে বলতে লাগলেন, বুঝলি শঙ্কর, দেশ স্বাধীন হলে আমায় যদি তোরা রাজা করিস—এই সেন্টিমেণ্টাল মেয়েগুলোকে সকলের আগে আন্দামান পাঠাব।···শোন রাণী, তোমার বাবাকে আমি বলে দেব কিন্তু—সত্যি বলে দেব। বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতকে প্রণাম করছ, জাত-জন্ম রইল না আর!

কিন্তু আমি কুন্তল-দার সঙ্গে হাসতে পারলাম না। রাণী যে কি রকম ভাবে কুন্তল-দার পায়ে মাথা রেখে নিস্পন্দ হয়ে রইল, সে কেমন করে বোঝাই! অনেকক্ষণ পরে উঠে মুখ নিচু করে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল।

এরই দিন দুয়েক পরে দেখলাম, রাণী আর হাসি ধরে রাখতে পারে না, যেন পাখীর মতো হাওয়ায় উড়ছে। আমি উঠানে পা দিতেই ছুটে এসে কানে কানে বলে, শুনেছ শঙ্কর-দা—কুন্তল-দা রাজি হয়েছেন, আমায় কাজ করতে দেবেন।

কুন্তল-দা বললেন, আগে পরীক্ষা দাও দিকি, তার পর সে-কথা।

বলুন, কি করব?

রাণী তখনই প্রস্তুত।

চট করে চাট্টি মুড়ি ভেজে আন। বর্ষার দিনে খাসা লাগবে।

রাণী ছুটে চলল। কিন্তু সন্দেহ করেছে, মুখ ফিরিয়ে বলল, আমায় এখান থেকে সরাতে চান ?

অল্পক্ষণের মধ্যে গরম মুড়ি এল। অত তাড়াতাড়ি কি করে করল, জানি না। মহানন্দে আমরা থালার চারপাশে বসে গেলাম।

কুন্তল-দা হেসে বললেন, দলের মধ্যে তোমার রইল এই মুড়ি-ভাজার কাজ। খুব বড় কাজ এইটে—জান ?

কিন্তু ওর চেয়েও বড় কাজ সে পেয়েছিল।

একদিন রাত্রে ঘুমুচ্ছি, এমন সময় ধাক্কাধাক্কিতে দোর খুললাম। বাইরে কুন্তল-দা বাইকে করে এসেছেন, চোখ জ্বলছে। আমায় বললেন, শোন্, খবর পেয়েছি—পুলিশে বাড়ি ঘেরাও করেছে, ভোর-রাতে সার্চ হবে। কিছু মাল সরাবার দরকার। ওপারে জগৎ দত্তর ওখানে পৌছে দিতে হবে। তুই আমাদের খালিশপুরের ঘাটে গিয়ে নৌকো ঠিক করে গাবতলায় দাঁড়িয়ে থাকবি। ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে মাল পৌছবে—বুঝলি ? আমি বাড়ি চললাম।

অতএব নৌকো ঠিক করে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অমাবস্যার কাছাকাছি একটা তিথি, তার উপর আকাশে মেঘ করেছে—বড় ভয়ানক অন্ধকার। ভৈরবে জোয়ার এসেছে, কোটালের টান। দেখতে দেখতে সেই গাবতলা অবধি জল এসে পৌছল। চেয়েই আছি—অনেকক্ষণ পরে দেখি, রাস্তা দিয়ে নয়—বাগানের ছায়ায় ছায়ায় ঘোমটা-ঢাকা একটা আবছা মূর্তি দ্রুতপদে আসছে। কাছাকাছি এসেছে, এমন সময় কোন্ দিক দিয়ে হঠাৎ জন দুই-তিন তার পথ আটকাল।

দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ ?

আলো ফেলেছে মুখের উপর। আমার জায়গা থেকে যতটা দেখা যায়, দেখলাম—অতি নির্ভীক অপূর্ব উমারাণীর মুখ। বলল, ঘাটে যাচ্ছি।

কেন ?

ঝাঁঝাল স্বরে রাণী জবাব দিল, একটু জিরোব বলে। বাবা বকেছে বড্ড। পথ ছাড়ুন।

তোমাকে থানায় যেতে হবে।

কিন্তু থানায় সে গেল না। তাদের পাশ কাটিয়ে চক্ষের পলকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোটালের টানে সুতীব্র স্রোত চলেছে, তার উপর এই রকম অন্ধকার। আমি গাবতলা থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম।

খবর পেলাম, সকালবেলা দ্বারিক চাটুজ্জের বাড়ি সত্যিই সার্চ হয়েছিল, কিছু পাওয়া যায় নি। পাওয়া যাবে না, সে তো জানতামই। বেলা একটা-দেড়টার সময় কুন্তল-দা হস্টেলে এলেন। আমায় বললেন, কলেজে যাচ্ছিস ? আজ আর যাস নে শঙ্কর, কামাই কর্। চল্, দুজনে বেড়িয়ে আসি।

ঠিক দুপুরে বেড়াবার সময় নয়, আর কুন্তল-দার যে রকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, তাতে বেড়াবার মতো অবস্থাও নয়, বুঝতে পারি। একটু দূরে খালের উপর একটা কাঠের পুল। তারই উপর কুন্তল-দা বসে পড়লেন, আমাকে বসালেন। বললেন, কি রকম সাহস আর বুদ্ধি মেয়েটার। দলটা তো সে-ই বাঁচাল। বাড়ি থেকে সাঁ করে বেরিয়ে গেল, তখন ওরা বুঝতে পারে নি। আর মেয়েমানুষের সুবিধা আছে, হঠাৎ কেউ ধরতেও পারে না।

আমি বললাম, রাণীর বাবা খুব বকেছিলেন বুঝি ?

কুন্তল-দা বললেন, সে তো হরদম চলছে। আমাকেও নোটিশ দিয়ে

রেখেছেন, ভাদ্র মাস কাটলে বিদায় হতে হবে। কিন্তু বকাবকির জন্য জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে, এরা কি সেই ধরনের মেয়ে? তোর হাতে যখন দিতে পারল না, রাণী ঠিক ভেবেছিল—সাঁতার দিয়ে ও-ই জগৎ দত্তের কাছে যাবে। তা পারে নি। আমি ওপার থেকেই আসছি। আহা, কাজের জন্য এমন করত বেচারি—গোড়াতেই চলে গেল!

অনেকক্ষণ ধরে এই সব কথাবার্তা হল। বলতে বলতে একবার কুন্তল-দা চোখ মুছে ফেললেন। পাষাণে জল আছে, এই প্রথম দেখলাম।

রাণীর কথা কত দিন ভেবেছি! পাড়াগাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিতা সাধারণ মেয়ে—কি-ই বা বুঝত, কতটুকু জানত—আঁধার রাতে নির্ভয়ে ভৈরবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পুলিসের টর্চ-আলোয় তার শেষ মুহূর্তের চেহারা কেবল আমিই দেখেছিলাম। সে আবার ভৈরবের জলশয্যা থেকে উঠেছে, এবং অন্তত পক্ষে দু-শ ভরি পরিমাণ জড়োয়া-গহনায় সর্বাঙ্গ মুড়ে রায়বাহাদুরের ঘর আলো করে আছে, এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। অথচ নিজের চোখ দুটোকেই বা অবিশ্বাস করি কি করে?

পরদিন গিয়ে পথের উপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দূর থেকে দেখছি, রায়বাহাদুর যথারীতি সমুদ্রের ধারে চেয়ারখানিতে উবু হয়ে আছেন। মহিলাটি এলেন—সে রাণীই। আমায় দেখে একটু আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলে, শঙ্কর-দা, কবে এলে এখানে? কোথায় উঠেছ?

আমি বললাম, রাণী, উমারাণী, তুমি বেঁচে আছ?

রাণী হেসে বলে, দস্তুরমতো বেঁচে আছি। আমার স্বামী কত বড়মানুষ—যেমন টাকায় বড়, তেমনি বয়সে। মস্ত খেতাব, প্রকাণ্ড জমিদারি।

কথা বলতে বলতে দু-জনে এগিয়ে চলেছি। রাণী বলে, তোমায় এক নজর দেখেই চিনেছিলাম, তুমি কিন্তু চেন নি।

আমি বললাম, চিনলেও যার অপমৃত্যু হয়েছে জানি, তার সঙ্গে হঠাৎ কথা বলতে সাহস হবে কি করে?

রাণী খিল-খিল করে হেসে উঠল। বয়স হয়েছে রাণীর, কত মোটা হয়ে গেছে, তবু আগেকার মতো হাসির সেই রকম মিষ্টি আওয়াজ, গালের উপর তেমনি টোল পড়ে। বলে, তা হলে আমি ভূত হয়ে চলছি তোমার সঙ্গে? তা সত্যি। আমি কি স্বপ্নেও জানতাম, এত সুখ আমার কপালে আছে?

গম্ভীর হয়ে গেল। আর খানিকটা এসে বলে, এবার সরে যাও শঙ্কর-দা। আমার সঙ্গে আর কেউ কথাবার্তা বলছে, দেখলে রাগারাগি করবে। বুড়ো হয়ে মেজাজের ঠিক নেই। এমন ভাব দেখাবে, যেন আমাদের চেনাজানা নেই। কাল সকালবেলা একবার আসবে এদিকে?

অত্যন্ত করুণ চোখে চেয়ে সে বলতে লাগল, যদি আসতে পার শঙ্কর-দা, মন্দিরে যাবার নাম করে আমি চলে আসি। কত কথা জমে আছে বুকের মধ্যে···বুক ফেটে বেরুতে চাচ্ছে।

সকালবেলা নিরিবিলি বসে অনেক কথা হল। রাণীর বিয়ের কাহিনী শুনলাম। অনন্তপ্রসাদ তখন খুলনায় ডেপুটি। এরই আগে এক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, হঠাৎ কলেরা হয়ে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সতীলোকে চলে গেছেন। থাকল একপাল ছেলেপুলে। অনন্ত সরকারি কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কে তাদের দেখে, তাঁকেই বা কে সেবা-যত্ন করে! ঝি-চাকর দিয়ে ঠিক হয়ে ওঠে না, মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন, ভেবে

কুল-কিনারা পান না। আত্মীয়েরা বিয়ে করতে বলেন, কিন্তু বিয়ে বললেই তো হয় না! তাঁরা শ্রোত্রিয়, এমনি সাধারণ ভাবে একবার বিয়ে করার মেয়ে পাওয়া কঠিন—তার উপর এতগুলো ছেলেপুলে থাকা অবস্থায়, এই বয়সে···চুল সমস্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। লোকে বলে, বাংলা দেশে মেয়ে সস্তা; তবু তো কোন মেয়ের বাপ এগোয় না!

কিন্তু ভগবদ্বিশ্বাসী লোক—সকল কাজের মধ্যেও তিন সন্ধ্যা আহ্নিক করতে ভুল হয় না—ভগবানই উপায় করে দিলেন। এক দিন গিয়েছিলেন বাগেরহাট অঞ্চলে একটা তদন্ত করতে। নৌকো করে ফিরছেন। শেষ রাত। একজন দাঁড়ি দাঁড় তুলে আ-হা-হা করে উঠল।

কি, কি ব্যাপার?

মানুষ একটা ডুবে যাচ্ছে।

অনন্ত বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি টর্চ ফেললেন জলে। কে-এক জন জলে দাপাদাপি করছে, হয়তো নৌকোর কাছাকাছি আসবার মতলব, কিন্তু পারছে না—তার হাত-পা যেন অসাড় হয়ে এসেছে, সাঁতার দেবার জো নেই। দাঁড়িরা লাফিয়ে পড়ল। সেখানটা চরের মতো জায়গা, জল বেশি নয়। তোলা হল।

অনেক কষ্টে রাণীর সামান্য চেতনা হল। অনন্ত তাকে খুলনার বাসায় নিয়ে তুললেন। বিকালের দিকে দ্বারিক চাটুজ্জেকে খবর দিয়ে আনা হল।

অনন্ত বললেন, গোলমালের কাজ কি বলুন। আপনার গ্রামের মধ্যেও তো নানা কথা উঠেছে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে। তার চেয়ে আমাকেই সমর্পণ করুন। কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না।

আপনাকে? দ্বারিক ইতস্তত করতে লাগলেন।

তা নইলে কিন্তু জেলে নিয়ে পুরবে। ওর কোমরের সঙ্গে রিভলভার

বাঁধা ছিল। জেলের চেয়ে কি আমার ঘর করা খারাপ হবে? বুঝে দেখুন ব্যাপারটা। মানী ঘরের মেয়ে—খবরের কাজে নাম বেরুবে, আর এই প্রসঙ্গে সত্য-মিথ্যা কত কি রটে যাবে।

বাপ নিরুত্তর হলেন। রাণী বলল, হোক জেল, আমার জেলই ভাল।

মৃদু হেসে অনন্ত বললেন, তা হলে এলুমিনিয়ামের কৌটোর উপর সিলমোহর করে যে কাগজগুলো যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, তা-ও পুলিসের হাতে পড়বে। তাতে তুমি একা নও—দলসুদ্ধ জালে পড়বে।

রাণী রাগে আগুন হয়ে উঠল।

সেটাও পেয়েছেন? আমি ভাবলাম, জলে পড়ে গেছে। দিন আমাকে, দিন বলছি—

অনন্ত পাকা লোক—ছেলেমানুষের রাগ দেখে তাঁর হাসি আরও বেড়ে যায়। বললেন, তাড়াতাড়ি কি! আমার কাছে থাকা যা, তোমার কাছে থাকাও তাই।···আচ্ছা, বউভাতের দিন দেব। অবশ্য সে পর্যন্ত যদি এগোয়। আর নইলে দিয়ে আসব থানায়।

বউভাতের দিনও অনন্ত দেন নি সে কাগজগুলো। রাণী মাঝে মাঝে চাইত, অনন্ত দেব দেব করতেন। তখনও তাঁর ভয় ঘোচে নি, জিনিষটা হাতে পেলে রাণী কি এই রকম সেবা-যত্ন করবে? এখন অনেক বৎসর হয়ে গেছে, চাইলে হয়তো দিয়ে দেন, কিন্তু রাণীরই খেয়াল হয় না—কি হবে তা দিয়ে? দেশের রাষ্ট্র-সংগ্রামে সে এক বিস্মৃত অধ্যায়। কাগজগুলো হয়তো ছিন্ন বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছে আয়রন-সেফের এক কোণে। কিংবা হয়তো নেই।

গল্প শেষ করে রাণী চুপ করে কি সব ভাবে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, কুন্তল-দা কোথায় এখন?

বললাম, জানি না।

কথাটা মিথ্যা—জেনেও বললাম না। কুন্তল-দা মারা গেছেন। কেউ জানে না, অমন বিরাট প্রাণ বরানগরের এক এঁদো গলির আধ-অন্ধকারে কেমন্ করে আস্তে আস্তে মৃত্যুতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সে সব খবর দিয়ে লাভ কি? কুন্তল-দা পৃথিবীতে নেই, রাণীর মনের মধ্যেও সে রকম ভাবে নেই, বুঝতে পারছি।

তার পর আমার নিজের কথাও অনেক হল। রাণী বলে, যতীশ্বরের চিঠি নিয়ে এসেছিলে, তবে আর কি! সেই সূত্রে আজকে আবার যেও আমাদের বাড়ি। নিশ্চয় যেও। আমি ওঁর সামনেই তোমার সঙ্গে আলাপ করব, তোমাকে রাত্রে খাবার কথা বলব। সেই গরম গরম মুড়ি ভেজে দিতাম। উঃ, কত দিন দেখি নি তোমাদের কাকেও। যাবে তো?

ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলাম। বিকালে যেতে বলেছে, রাণী নিমন্ত্রণ করবে। এখন বড়লোকের বউ—মুড়ি খাওয়াবে না, আয়োজন গুরুতর হবে নিশ্চয়। হোটেলের ঘ্যাঁট খেয়ে এই ক'দিনে অরুচি জন্মে গেছে। কিন্তু চলতে চলতে সাব্যস্ত করলাম, যাব না ওদের বাড়ি। বরঞ্চ আর যাতে দেখা না হয়, পুরী ছেড়েই চলে যাব। এই ক'টা দিন ভুলে যাই—রাণীর অপমৃত্যু হয়েছে, এই কথাই থাক আমার মনে। গাঢ় আঁধারের মধ্যে বিনা দ্বিধায় করাল ভৈরবে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—পুলিসের টর্চের আলোয় সেই ছবি দেখেছিলাম, সেইখানে রাণীর কাহিনীর সমাপ্তি হয়ে থাক।

## আনন্দকিশোর

এক সাধু মহারাজের গল্প বলছি এবার, আমাদের আনন্দকিশোর। তোমাদের হাসি পাবে, আবার চোখে জলও আসবে নিশ্চয়।

কুন্তল-দা তখন তৃতীয়বার জেল খেটে বেরিয়ে এসেছেন। কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি চুকে গেছে। এবার শহরে আস্তানা গাড়বার ভয়ানক দরকার। বাবা তখন বেঁচে। তাঁকে বললাম, মফস্বল কলেজে পড়াশুনো কিছু হয় না। এত দিন যা হোক চলেছে, এখন বি-এ পড়ার সময় কলকাতায় না গেলে নির্ঘাৎ ফেল হব।

বাবা হেসে সম্মতি দিলেন। ব্যাপারটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। মহাস্ফূর্তিতে শহরে এলাম। কলেজে ভর্তি হয়েছি। বিকেল বেলা প্রায় রোজই বরানগরে নদীর কাছাকাছি এক একতলা ভাঙা বাড়ির ছাতে গিয়ে সকলে জুটি। কখন বিকাল হবে, সে জন্য মন পড়ে থাকে। কেবল কুন্তল-দা নয়, ঐ বাড়িতে মা থাকেন। কুন্তল-দার মা—তোমার আমার সকলের মা—অসীম ধৈর্যের মূর্তি। হাসিমুখে মা আমাদের আহ্বান করতেন। তাই তো ভাবি, অমন মা না হলে কুন্তল-দার মতো ছেলে জন্মায়!

মাস দুয়েক পরের কথা। একদিন দেখি, সবাই এসেছে—কুন্তল-দা নেই। সন্ধ্যার পরে তিনি এলেন—সঙ্গে বছর কুড়ি বয়সের ফুটফুটে একটা ছেলে। অবাক হয়ে চেয়ে আছি। কুন্তল-দা বললেন, বড্ড নাছোড়বান্দা—কি করা যায় বলো! কিন্তু খাসা বেহালা বাজায়।··· বেহালাটা আনো নি বুঝি আনন্দকিশোর?

বেহালা না এনে যেন মস্ত অপরাধ করে বসেছে, এমনিভাবে ছেলেটি ঘাড় নিচু করে রইল।

এই বেহালা পরে একদিন শুনেছিলাম। যতক্ষণ বাজনা চলছিল, চেয়ার ঠুকে ঘাড় নেড়ে কুন্তল-দার সে কি তারিফ! তারপর বললেন, কেমন, ভাল লাগল না? সত্যি বলো—

হুঁ, এখন লাগছে—খুবই ভাল লাগছে। থেমেছে বলে।

ঠাট্টা ? তারপর কুন্তল-দা আনন্দকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, তুমি কিছু মনে করো না, ভাই। ওরা সব অসুর—সুরের কি বুঝবে ?

হিরণ বলল, স্বদেশি ছেড়ে এবার যাত্রার দল খুলে দাও কুন্তল-দা। চৌরঙ্গিপাড়ায় গাওনা শুরু কর, ইংরেজ ডাক ছেড়ে পালাবে।

বেহালা বাক্সবন্দি করে আনন্দ ম্লানমুখে নেমে চলল। কুন্তল-দা ডাকলেন, হল কি তোমার ? শোন—শোন—

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে বলে, আপনার সমস্ত ফাঁকি কুন্তল-দা। বাজনা খারাপ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বাজাতে তো আসি নি। কাজ চাচ্ছি, সে সম্বন্ধে একটা কথা নেই—

মজা লাগছিল বেশ। আমি গিয়ে আনন্দর হাত ধরলাম।

কাজ ? কি কাজ করবে ভাই ? গায়ে দেখছি তো হাড়-মাংস নেই, তুলো দিয়ে তৈরি বুঝি ? কি কি করতে পার, বল—

কুন্তল-দা বললেন, পারে ঐ বেহালা বাজাতে, আর ঝগড়া করতে। দিন-রাত আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে, বলে—কাজ দিন, কাজ দিন—

আনন্দ বলল, ঝগড়া না করলে আপনি কি সায়েস্তা হন কুন্তল-দা ? আপনি বড্ড একচোখো।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে থাকি, বলে কি ! কুন্তল-দাকে এত বড় কথা বলবার সাহস ওর হল কি করে ? কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, শুনলি শঙ্কর ? কথার শ্রী দেখ্। এই রকম যখন-তখন গালি দেয়।

অতএব বুঝে ফেললাম, ঐ হতভাগারও মরণ হয়েছে আমাদের মতো। নিতান্ত কচি নিষ্পাপ মুখখানার দিকে চেয়ে নিশ্বাস পড়ল। কুন্তল-দার মতো হই নি এখনো, চোখের জল বুকের নিশ্বাস একটু-আধটু আছে। বললাম, অন্যায় বলে নি কুন্তল-দা।

তোদেরও কি এই মত নাকি ?

হ্যাঁ, সত্যি তুমি একচোখো। এত বছর গুরুমান্য দিয়ে আসছি, আর আজ কোত্থেকে এক রত্তি ঐ ননীর পুতুল জুটিয়ে আনলে, এনেই কোল বাড়িয়ে দিলে ? এতে হিংসা হয় না ?

কুন্তল-দা ভালমানুষের মতো আমায় দেখিয়ে বললেন, আনন্দ, এই শঙ্কর হল সেক্রেটারি। ও যতক্ষণ না দেবে, কেউ কোন কাজ পায় না। একে ধরো, আচ্ছা করে ধরো, কিছুতে ছাড়বে না, বুঝলে ?

তাই বিশ্বাস করল ছেলেটা। তারপর সে যে কি মুশকিল, তোমাদের কি করে বোঝাব ভাই। সকাল নেই, দুপুর নেই, যখন তখন গিয়ে ধরনা দেয়। আর ঐ এক কথা, কাজ দিন, কাজ দিন।

অবশেষে কুন্তল-দাকে ধরে পড়লাম, আর পারি না। দোহাই দাদা, বাঁচাও।

কুন্তল-দা হেসে উঠলেন। কেমন জব্দ ? নিন্দে করবি আমার ? নাকে খৎ দে আগে।

ভাদ্র মাস পড়ল। খবরের কাগজে যথারীতি বন্যার খবর বেরুচ্ছে। নানারকম সমিতি গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে—হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বন্যাত্রাণ করে বেড়াচ্ছে। এই সময়ে কয়েকটা দিন আমি গ্রামে ঘুরে এলাম। কেন তা বলব না। যাহোক একটা আন্দাজ করে নাও। সবাই জানত, জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাবাকে দেখতে গিয়েছিলাম। চাষাপাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম। আলাপ করে দেখেছি, দু'বেলা ভাত খাওয়া এবং আস্ত অখণ্ড কাপড় পরা মানবজীবনের চরম বিলাসিতা বলে তারা জেনে রেখেছে।

সেই সব কথাই হচ্ছিল। বললাম, মানুষ সব না খেয়ে মরছে।

কুন্তল-দা বললেন, মরুক।

বাড়িয়ে বলছি ভাবছেন? মোটেই নয়। চালের দর কত জানেন?

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে কুন্তল-দা বললেন, আমি তো তাই বলছি। মরে যাক। খাওয়ার মানুষ না থাকলে চালের দর কমবে।

হিরণ রাগ করে বলে, তুমি পাষাণ—একেবারে পাষাণ—

সেটা কি আজ জেনেছ? বলতে বলতে কুন্তল-দা কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন, ও-কথা সকলের আগে বলেছিলেন আমার ঠাকুরমা। তিনি আমায় মানুষ করেছিলেন, দেখা হলেই কাঁদা-কাটা করতেন। সেই ঠাকুরমা মৃত্যু-শয্যায়—খবর এল। আমি বাড়ি গেলাম না—চললাম কুঠির বস্তিতে।

আনন্দকিশোরও ছিল সেখানে, সে আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেল। চুপি-চুপি বলে, এইবার আমায় কাজ দিতে হবে শঙ্কর-দা, নয় তো আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

হয়েছে কি?

আপনার ঐ চাষাদের ব্যবস্থা আমি করব।

মড়া পোড়াবার ব্যবস্থা?

জিভ কেটে আনন্দ বলল, ছি ছি—কি যে বলেন! ওদের বাঁচাব। কত টাকা আদায় করে আনব দেখবেন।

কুন্তল-দা কি সব বললেন—শুনেছ তো?

ও আমি মানি না। ওঁর জুড়ি ভূ-ভারতে নেই। ঐ কি ওঁর মনের কথা হতে পারে? কখনো নয়।

অবোধ ছেলে! মানুষটার মতো ভূ-ভারতে নেই, কিন্তু মনটি ধরে নিয়েছে তোমার আমার দশজনের মতো। বড় বড় চোখ মেলে পরম আগ্রহে আনন্দ আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বলে, একটা বার বিশ্বাস করে দেখুন-না। প্রাণের আমি পরোয়া করি না। শুধু একটা—

হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল। হাসি চেপে বললাম, রিভলভার?
দিয়ে দেখুন একবার। কাজ করতে না পারি ফিরিয়ে নেবেন—

আনন্দ আমার পিছু-পিছু চলেছে। গলির মোড়ে এসে দোতলার ঘরটা দেখিয়ে দিলাম। আলো জ্বলছে, অর্গানের আওয়াজ আসছে। কানে কানে বললাম, সোজা উপরে চলে যাবে—বুঝলে? ঝি-চাকরেরা নিচে। বাড়িতে আছে একটি মাত্র মেয়ে—আর সবাই নেমন্তন্নে গেছে। পারবে তো?

ঘাড় নেড়ে আনন্দ বলে, খুব-খুব···একটা তো মেয়ে! ও আর শক্ত কি? আপনি তবে এইখানে দাঁড়ান—

দাঁড়াতে হবে? ফিরবার সময় ভূতের ভয় করবে বুঝি!

তার মুখ লাল হয়ে উঠল, গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলাম। বলে, যান, আপনি চলে যান শঙ্কর-দা—না, কিছুতে থাকতে পারবেন না।

হাসতে হাসতে পার্কের কোণে বেঞ্চির উপর বসি। এই একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পার্কে জল জমেছে। মনে ভাবলাম, কাঁহাতক এ রকম ভিজে মরব! বাড়ি গিয়ে শুইগে। চেনা চাক্ষুষ—চেনা বাড়ি—জলে পড়ে নি তো!

বাড়িটা সরোজ পাকড়াশির, সরোজের কথা আগেই বলেছি ভাই—আমাদের সেই সরোজ। মাস তিনেক আগে তাকে জেলে নিয়ে পুরেছে। নিরুপমাও প্রায় সেই সঙ্গে কলেজে ইস্তফা দিয়েছে; দাদার তাড়নার ভয় নেই, হস্টেল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি এসে বসেছে।

পরের দিন ঐ গল্প হচ্ছিল। নিরু এসেছে—সে বড় একটা আসে না—কিন্তু বিশেষ করে ঐ রোমাঞ্চকর স্বদেশি ডাকাতির গল্প বলবার জন্য এসেছিল। হেসে হেসে এবং রীতিমত ডালপালা সংযোগ করে সে

কুন্তল-দা হো-হো করে তুমুল হাসি হেসে উঠলেন। বললেন, শুনেছ তোমরা? আমাকে নতুন সার্টিফিকেট দিচ্ছে—আমার নাকি ভয়ানক মায়া! আমার ঠাকুরমার গল্পটা শোনে নি বোধ হয়।

আনন্দ বলে, শুনেছি দাদা। কুঠির বস্তিতে মানুষগুলোকে জানোয়ারের মতো রেখেছিল। আপনার মতো দরদ কার? তাদের দুঃখে ঠাকুর-মাকেও শেষ দেখা দেখতে পারেন নি।

জানোয়ারের জন্য মানুষের দুঃখ? কি যে বলিস—

হয় না?

কুন্তল-দা নির্মমকণ্ঠে বললেন, না। দরদ বলিস—যা বলিস, যদি কিছু আমার থাকে, সমস্ত আগামী দিনের সোনার মানুষের জন্য। শিরদাঁড়া-ভাঙা ভার-বওয়া গোরু-গাধার জন্য আমি এতটুকু ভাবি নে।

উষ্ণ কণ্ঠে আনন্দ বলল, তবে ঠাকুরমার কাছে না গিয়ে বস্তিতে ছুটেছিলেন কেন?

হাঙ্গামা বেধেছিল, সেটা যাতে মিটে না যায়। আগুন আমি নেবাতে চাই নি।

দেশের বুকে দাবানল জ্বালিয়ে আপনার আনন্দ?

কুন্তল-দা হা হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন, হ্যাঁ, ভাঙা ডাল ঝড়ে-নড়া গাছ সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাক। তারপর এই শ্মশান আবার সবুজ হয়ে উঠবে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে আনন্দ দু'হাতে মুখ ঢাকল। সে যে কি রকম অসহায়ের অবস্থা, তোমাদের বোঝাতে পারব না। কুন্তল-দা স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ তার মুখে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নিরুপমা ঠিক নাম দিয়েছে—সাধু মহারাজ। তুমি কোন আশ্রমে চলে যাও আনন্দ। জানাশোনা আছে, আমি বলে দিতে পারি।

কুন্তল-দা ফেরারি হলেন এই সময়টায়। ও-রকম অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছ কেন তোমরা?—সে ভয়ানক কিছু নয়। নিরুদের দোতলায় সিঁড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমুতেন। নিরুর চোখের উপরে—কাজেই বুঝতে পারছ, অসুবিধা কোনো কিছুরই হবার জো ছিল না—মায় গদির বিছানা ও নেটের মশারি পর্যন্ত। কেবল এক-একদিন অনেক রাত্রে পালিয়ে বরানগরে চলে আসতেন। আমরা রাগারাগি করতাম, বলতাম, সুখে থাকতে তোমায় ভূতে কিলোয় দাদা। একদিন মরবে—

কুন্তল-দা মুখ শুকনো করে বলতেন, তাই তো—তোমরা ভাবিয়ে তুললে। সর্বনাশ! একদিন নাকি মরব। একেবারে আপ্তবাক্যের মত শোনাচ্ছে হে—

আনন্দ সেই থেকে বড় একটা আসত না। এলেও কোণের দিকে মুখ নিচু করে চুপচাপ থাকত, কোন রকম কাজের কথা উঠলেই সরে পড়ত। তারপর একেবারে ডুব দিল।

মাস আষ্টেক আর দেখি নি তাকে। একদিন খুব ভোরবেলা আমার ঘরে এলো প্রেতের মতো একজন। কথা না বললে চিনবার জো নেই—কি বীভৎস চেহারা!

চমকে উঠলাম, আনন্দ—তুমি?

সে হাসতে লাগল।

এ কি হয়েছে রে? কোথায় ছিলে এদ্দিন।

হাসপাতালে ছিলাম, শঙ্কর-দা। ভালো থাকলে কি দেখতে পেতেন না? আপনারা আমাকে যতই ঘৃণা করুন, ঠিক আসতাম।

আমি বললাম, ঘৃণা করি না ভাই। কিন্তু সোনার মতো মুখ পুড়ে যে—

হনুমান হয়ে গেছে, না? হাসিমুখে সে বলতে লাগল, আমি বড্ড

খুশি হয়েছি। এই মুখের জন্য কত ঠাট্টা করেছেন। বলতেন, মেয়েমানুষ··· আরও কত কি! এবার?

কি ব্যাপার বল তো?

বাজি তৈরি করতে গিয়েছিলাম।

কি বাজি, বল—লুকিও না।

অভিমানের সুরে আনন্দ বলতে লাগল, সে যাই হোক—আপনাদের তা শুনে দরকার কি শঙ্কর-দা? আপনারা তো ভরসা করতে পারেন নি! আমি নিজে যদি কিছু করে থাকি। দেখুন—এবার আর মেয়েলি মুখ নেই তো?

আমি বললাম মনটা তো বদলায় নি ভাই। তুমি যাও—লেখাপড়া কর গিয়ে। এ পথ ছেড়ে দাও।

আনন্দ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিক। তারপর কাছে এসে হঠাৎ পায়ের ধুলো নিল। বলে, তাই ঠিক। চললাম শঙ্কর-দা—আর কোন দিন আপনাদের কাছে আসব না।

আবার ক'দিন ছিলাম না কলকাতায়। এসেই নিরুদের ওখানে গিয়েছি। কুন্তল-দা বললেন, আমি যে মরে গিয়েছি শঙ্কর। আজকের কাগজে দেখিস নি?

সে কি?

এই দেখ্—

কাগজে কুন্তল সরকারের মৃত্যু-সংবাদ পড়লাম। শ্যামবাজারে এক বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে স্বদেশিওয়ালাদের গুলি-ছোঁড়াছুড়ি হয়—ফলে কয়েকজন জন মারা পড়ে, তার মধ্যে কুন্তল সরকারও আছে।

সন্ধ্যাবেলা সমস্ত খবর নিয়ে ফিরলাম। নিরু বলে, আমাদের সেই সাধু মহারাজ, না শঙ্কর-দা ?

হ্যাঁ। কোত্থেকে কুন্তল-দার নামের ক'খানা চিঠি জোগাড় করেছিল। তাই পকেটে রেখে দিয়েছে। মুখ পুড়িয়ে আগেই এমন করে রেখেছে যে চেনবার জো নেই—

পাষাণ কুন্তল-দা, তবু যেন তাঁর স্বর একটু কাঁপল। কিংবা হয়তো আমারই ভুল—ঐ হিমালয় ঝড়-ঝাপটায় কাঁপবার বস্তু নয়। বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন, মৃদু কণ্ঠে বললেন, বোকা ছেলে! অত সহজে কি কুন্তল সরকারকে ঠেকানো যায় ? মিছেই মারা পড়লি।

নিরু এত জ্বালাত, বিদ্রূপ করত -চোখের জল এখন আর তার বাধা মানছে না। বলল, একটা ফুল আগুনে পুড়ে গেল কুন্তল-দা।

কুন্তল-দা বললেন, নূতন সূর্য উঠবেই। তার আগে আনন্দ গেল, আমিও যাব। এই রকম কত চলে যাবে। কাঁদতে গেলে চলে কি বোন ?

সূর্য আজ উঠছে। কুন্তল-দাও নেই। পনের বছর আগে তিনি চোখ বুজেছেন। কিন্তু তার আগে নিরুপমার বৃত্তান্তটা গোড়া থেকে বলে নিই, শোনো। নিরুপমার সঙ্গে নিবিড়তম সম্পর্ক কি না—সে আমার বউ। কিন্তু খবরদার ভাই, মল্লিকার কানে কথাটা না যায়। সে জেলে যায় নি, কিন্তু ঘরে বসে যা সয়েছে তা তোমার আমার চেয়ে কম নয়। কি জানি, মল্লিকা কি মনে করে বসবে—আমার সেই ভয়।

## নিরুপমা

তখন শ্যামবাজারের এক গলির মধ্যে ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই গলির একটা বিশেষ বাড়ির কাছাকাছি আমাদের দু'একজনের থাকার দরকার। মাপ করো ভাই, আজকের দিনে এর বেশি কিছু বলতে

পারব না। মোটের উপর সকাল-সন্ধ্যা খোঁজাখুঁজির বিরাম ছিল না। কিন্তু গলির লোকগুলো অকস্মাৎ যেন বিষম বড়লোক হয়ে উঠেছে, বাড়ি ভাড়া দেওয়ার গরজ কারও নেই। ঘর পেলাম না, কিন্তু পেয়ে গেলাম নিরুপমাকে।

মেয়েটাকে এক নজর মাত্র দেখলাম। লম্বা-চওড়া গড়ন। তখন সন্ধ্যাবেলা, মই ঘাড়ে করে মিউনিসিপ্যালিটির লোক গ্যাস জ্বেলে জ্বেলে বেড়াচ্ছিল। বটতলায় সিঁদুর-মাখা অনেকগুলি পাথর—তারই সামনে তাদের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা। বাড়ি ঢুকে কোন দিকে না চেয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

মাথায় এক মতলব এসে গেল। মেয়েটাকে যদি দলে টানতে পারি, ঘর না পেলেও চলবে। পিছু নিলাম। কয়েকটা দিন কেটে গেল। এক দিন কলেজ-ফেরতা সে গটমট করে চলেছে, আমি খুব সন্তর্পণে দূরে দূরে যাচ্ছি, গলিতে ঢুকে সে চোখের আড়াল হয়ে গেল। মিনিটখানেক পরে আমি মোড় ফিরে যেই ঢুকেছি—দেখি, একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে নিরুপমা দাঁড়িয়ে আছে আমার অপেক্ষায়। একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তি—রক্ষার মধ্যে হাতে কিছু নেই খান দুই-তিন মোটা বই ছাড়া।

তুমি পিছু নিয়েছ কেন?

আমি বললাম, পথ কি কারও একলার?

বল, কি জন্যে?

ভদ্রলোককে যে ভাবে অনুরোধ করতে হয় সেইভাবে বলুন, তবে জবাব দেব।

আপনি ভদ্রলোক?

কি রকম ফিটফাট জামাকাপড় পরে আছি—ভদ্রলোক মনে হয় না? দেখুন না—চেয়ে দেখুন একবার—

নিরুপমা মুখ একেবারে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ইতিমধ্যে অবশ্য অনেকবারই সে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়েছে—দেখা বললে ঠিক হয় না, দৃষ্টি দিয়ে আগুন বুলিয়ে দিয়েছে। ব্যঙ্গের সুরে সে বলে, বাংলা দেশ কি না— আপনাদের তাই ভদ্রলোক বলে।

সব দেশেই আমরা ভদ্রলোক। অসহায় মেয়েকে সঙ্গে করে বাড়ি এগিয়ে দিচ্ছি—এ কাজ বীরধর্মের কোঠায় পড়ে, জানেন?

আমি অসহায়?

নিশ্চয়। একলা চলেছেন, বিশেষ তো অস্ত্রশস্ত্র দেখছি নে। ধরুন যদি কেউ আপনার একখানা হাত চেপে ধরে—

মুখ ফেরাল নিরুপমা। বলে, আমি চেঁচিয়ে উঠব। আমাদের পাড়া — এতটুকু বয়স থেকে এখানে মানুষ—

তার আগে যদি মুখ বেঁধে ফেলে? হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার গলার এই চাদরটার মতো একটা-কিছু দিয়ে মুখ বাঁধা তো শক্ত কিছু নয়।

নিরুপমা দাঁড়িয়ে যায়।

আপনার মতলব কি?

আমি হেসে বললাম, আর যাই হোক, মুখ বাঁধা কিংবা হাত ধরাধরির জন্য চারটে থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম না।

তাদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছি। দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলে, আসবেন?

না।

ভয় করছে?

আমি বললাম, ভয়ের নমুনা দেখছেন কিছু? রণে আর প্রেমে ভয় করলে চলে না।

এবার সে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল। অসাধারণ মেয়ে—এই প্রথম আলাপে টের পেলাম। বলে, ইস— অবস্থা সাংঘাতিক তো!

কিন্তু প্রেম নয়।

তবে বুঝি রণ? কার সঙ্গে—আমারই সঙ্গে নাকি?

প্রথম আলাপে না-ই শুনলেন সে কথা। কাল বিকালে আবার আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

পরদিন দেখা হল। তার পরদিনও। মনে রেখো, সেটা পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, এখনকার চেয়ে কড়াকড়ি ঢের বেশি ছিল। এক ধরনের কাজ মেয়েদের দিয়ে ভাল হয়, আমাদের মধ্যে দু-চারটি মেয়ের দরকার, পথে-ঘাটে তাই ঐ রকম ওৎ পেতে থাকতে হত। নিরুর বাড়ির সম্বন্ধে যা শুনলাম, সে একেবারে আশাতীত। দুই ভাই আর বোনটি; আর আছে বুড়ো মা; তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত কিছু নয়। ছোট ভাই নাবালক, আর বড় হলেন—নাম তো আগেই করেছি, সরোজ পাকড়াশি।

আমাদের সরোজ? কুন্তল-দা বললেন—সরোজের বোন, তাই বল। এমন ইস্পাতের মেয়ে যেখানে সেখানে পেয়ে যাবে, আমি তো অবাক হয়ে

তোমার সরোজকে আমরা দেখি নি তো।

কুন্তল-দা বললেন, দেখবে কি করে? ক'টা দিনই বা জেলের বাইরে থাকে!

একটু স্তব্ধ থেকে বলতে লাগলেন—হতভাগাটা বলে কি জান? ছ'টা মাস থাকতে দিক, তুড়ি মেরে দেশ স্বাধীন করব। তা কর্তারা ছ'টা দিনও তাকে বাইরে রেখে সোয়াস্তি পান না।... বেশ হয়েছে, মেয়েটা একমনে এবার কাজে লাগুক।

কিন্তু মোটে আমাদের আমলই দেয় না, কুন্তল-দা—

বস্তুত নিরুপমা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বলে, মিথ্যা কথা, আপনারা সব ধাপ্পাবাজ—আমি ও-সব এক তিল বিশ্বাস করি নে।

আমি বলি, এখন সব ঘনিষ্ঠ বিশেষণ প্রয়োগ করছ নিরু, এর মধ্যে এতখানি প্রত্যাশা করি নি।

নিরু কালো বড় বড় চোখ দুটো মেলে খানিক চেয়ে থাকে। শেষে বলে, বেশ, নিয়ে আসুন একদিন কুন্তল-দাকে। আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন রইল। তিনি নিজের মুখে বলবেন—

ঘাড় নেড়ে বলি, এখন তা হতে পারে না।

কেন? কলকাতায় নেই? কোথায় তিনি?

সরোজের বোনকে এটাও কি বুঝাবার দরকার, যে এ সমস্ত জিজ্ঞাসা করতে নেই?

নিরুর উচ্ছ্বাস থেমে যায়। লজ্জিত হয়ে সে চুপ করে।

আমি বললাম, অত সহজে কুন্তল-দাকে পাওয়া যায় না।

কি করতে হয়?

সাধনা। দেখছ না, সরকার বাহাদুর বছরের পর বছর কি অসামান্য সাধনায় লেগে আছেন।

আমি তো সরকারের কেউ নই।

অতএব একদিন দেখা পাবে, নিশ্চয় পাবে। তাঁর কাজে লেগে যাও।

নিরু বলল, অন্তত একছত্র হুকুম চাই তাঁর হাতের।…মানে, তাঁকেই মানি, একমাত্র তাঁকে। আপনাদের কাউকে নয়।

বরানগরের সেই একতলা বাড়িতে তখন একটা তুলোর গুদাম হয়েছে। গুদামের পিছনটায় আধ-অন্ধকারে কুন্তল-দা বইয়ের গাদার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতেন। যে ধন্বুরির গুদাম, সে আমাদেরই একজন। সে ঘরে

যে মানুষ থাকে, বাইরের থেকে বোঝবার জো ছিল না। একদিন ক'জনে একত্র হয়েছিলাম। কুন্তল-দা বললেন, মেয়েটা নেমন্তন্ন করেছে, তা যাই না কেন—একদিন ভালমন্দ খেয়ে আসি।

সবাই প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়ে। না—না—না—

তিনি হেসে বললেন, হিংসুটের দল তোমরা, আমার ভাল কি দেখতে পার ?···দাও তবে, এক টুকরো কাগজই দাও—

এবং তৎক্ষণাৎ শুরু করলেন, শ্রীচরণাম্বুজেষু—

আমরা হেসে উঠতে কুন্তল-দা কলম তুলে বলেন, কি, হল কি তোমাদের ?

ও কি লিখছ ? সতের-আঠার বছরের একরত্তি একটা মেয়ে যে নিরুপমা।

চিঠি নিরুপমার কাছে পৌঁছল। তারপর দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না। বলে, দেখুন শঙ্কর-দা, খাতিরটা দেখুন একবার ! আমি হলাম শ্রদ্ধাস্পদা। কুন্তল-দার সার্টিফিকেট—অতএব আপনারাও শ্রদ্ধা করবেন। বুঝলেন তো ?

আবার বলে, আপনাদেরও উনি এই রকম লেখেন নাকি ?

আমি বললাম, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাই নি, তেমন ভাগ্য হবে কোত্থেকে ? বিবেকানন্দর চোখ দিয়ে দেশ দেখেছেন ওঁরা—অনাত্মীয় মেয়ের ঐ একটি মাত্র মূর্তি ওঁদের কাছে।

মোটের উপর, যা চেয়েছিলাম—হল। নিরুকে পাওয়া গেল।···

এখন সে বেঁচে নেই। আহা, যদি থাকত ! তুমি আমি সকলে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছি, এ সমস্ত দেখে কত উৎসাহ হত তার ! তার নির্ভীকতা তখনকার দিনে আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

মাস দুই পরে একদিন আমাদের আস্তানায় সে যেন আকাশ ফুঁড়ে উদয় হল। অনেক রাত্রি, ছাতের উপর অল্প অল্প জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, কথাবার্তা হচ্ছিল—সব বন্ধ হয়ে গেল। কোথা থেকে কি করে জানল, কে-ই বা দুয়োর খুলে দিল! তারপর দেখি, হিরণ পিছনে রয়েছে।

নিরু জুতো খুলতে খুলতে সকলকে এক নজর দেখল। তার পর কুন্তল-দার পায়ে গিয়ে প্রণাম করল। আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে, কেমন শঙ্কর-দা, চিনতে পেরেছি কিনা বলুন—

আমি বললাম, 'আগে দেখেছিলে?

নিরু বলে, কক্ষনো নয়—সূর্যকে কি চিনে রাখতে হয়? হাজার লোকের মধ্যে ওঁকে বেছে নিতে এক মিনিটও লাগে না।

কুন্তল-দা বললেন, সর্বনাশ, বল কি গো! ভয় ধরিয়ে দিলে।

নিরু বলে, আপনার ভয় আছে নাকি?

আমি বলি, ওঁর নেই, আমাদের কাছে।...শুনে রাখলে তো? অতএব ঘর থেকে তোমার মোটে বেরুনো চলবে না—এক পা- নয়—

কুন্তল-দা বললেন, কেন—বেরুলে হবে কি?

চিনে ফেলবে। ধরে নিয়ে জেলে আটকাবে।

তোমরাই বা কি এমন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছ!...নিরু, জানিস নে বোন—জীবনে এরা ঘেন্না ধরিয়ে দিল। কোন কাজ করতে দেবে না, কোথাও যেতে দেবে না—এ রকম বেঁচে লাভ কি?

নিরুপমা কুন্তল-দার পায়ের কাছে বসে পড়ল। আমরা এদিকে রাগে জ্বলছি। কুন্তল-দা না থাকলে সেইখানেই হিরণের টুঁটি চেপে ধরতাম। আমরা এত সাবধান করে মরি, আর হতভাগা মেয়েটাকে এনে জোটাল এই জায়গায়!

চোখ-ইশারায় হিরণকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি—দেখি, কুন্তল-দাও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, হিরণের দোষ কি ?

ওঃ, তুমি বলে দিয়েছিলে ?

কুন্তল-দা রাগত ভাবে বলে উঠলেন, না বলে উপায় ছিল ? যত সব বদরাগী মানুষ নিয়ে দল গড়বে, দোষের বেলা হিরণ আর কুন্তল-দা।

নিরুপমার কানে যেতে সে মাথা নিচু করল। আমরা উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠি, ইতিমধ্যে কি এমন ঘটে গিয়েছে যার জন্য তাড়াতাড়ি কুন্তল-দা হিরণকে পাঠালেন। রাত্রিবেলা আমরা সবাই তো আসব—পরামর্শের সবুরটুকুও সইল না!

আবার বসে পড়ে তিনি নিরুকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, দুঃখ পাচ্ছ কেন বোন, তোমার দোষ কি ? তুমি কেবল থানা অবধি গিয়েছিলে, আমরা হলে মহানন্দটাকে শেষ করে ফেলতাম।

নিরু জিজ্ঞাসা করে, আপনি মানুষ মারতে পারেন কুন্তল-দা ?

কুন্তল-দার যেন কানে ঢুকল না, তিনি বলেই চলেছেন।

আমি বলি, ে নব কথা কেন নিরু ? ছিঃ—

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, উনি মোটে পারেনই না, আমি বলে দিচ্ছি। এত যাঁর স্নেহ—

কুন্তল-দা বললেন, তুমি পার ?

মানুষ পারি না, জানোয়ার পারি। অন্তত পারা উচিত।

একটু চুপ করে থেকে নিরুপমা বলতে লাগল, এক দিন এ দেশে জানোয়ারের বাড়াবাড়ি হয়েছিল। মা-বোনেরা স্নেহ দিয়ে লালন করেছিল তাদের। স্নেহ না দিয়ে মুখে বিষ তুলে দিলে ঠিক হত। তা হলে আজকের এ রকম দিন আসত না। সেই রকম জানোয়ার একটা হচ্ছে আপনাদের মহানন্দ—

কুন্তল দা বললেন, মহানন্দ তো আমাদের নয়—

আমি বললাম, বিশ্বাস করতে চায় না কুন্তল-দা, আমার সঙ্গে সে কি তর্ক!

মহানন্দের সঙ্গে ইস্কুলে কিছু দিন পড়েছিলাম। সেই থেকে আমাদের দু-এক জনের সঙ্গে তার অল্পসল্প পরিচয়। মহানন্দ তাই নিয়ে গালগল্প করে বেড়াত। নিরুদের সঙ্গে তার দূরসম্পর্কের কি রকম একটু আত্মীয়তা ছিল। সেই দিনই সকালবেলা নিরু আমাকে খুব জেরা করছিল—আপনি যে বলেন, কুন্তল-দা এখানে নেই?

ছিলেন না। এসেছেন ক'দিন হল।

মিথ্যে কথা। তিনি বরাবর রয়েছেন। মহানন্দ কাকা বললেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি, সর্বনাশ—ওর সঙ্গে এই সব কথা হয় নাকি? বাজে লোক।

নিরুপমা বলে, বাজে লোক হলে কুন্তল-দা নিয়েছেন?

কুন্তল-দা তাকে চেনেনই না।

বলেন কি? কুন্তল-দা গয়না চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, যে চিঠি পর্যন্ত রয়েছে—

গায়ে পরবেন বলে?

নিরু বিরক্ত হয়ে বলে, পরবেন কে বলেছে? হয়তো কাজে লাগাবেন বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে—

তালুক নিলাম হচ্ছে বুঝি কুন্তল-দার—মেয়েমানুষের গয়না বন্ধক দেবেন?

কিন্তু টাকার কি গরজ নেই?

আছে। সে সামান্য ব্যাপার। আমরা বন্যাত্রাণ-সমিতি গড়ি নি নিরু, যে তোমার কাছে দয়ার দান চাইতে যাব।

নিরু ক্ষণকাল যেন নিস্পন্দ হয়ে থাকে। তার পর বলে, মহানন্দ-কাকা বলল, কুন্তল-দার সঙ্গে দেখাশোনা করিয়ে দেবে, তার বাড়ি নিয়ে যাবে—

সাবধান নিরুপমা, কুন্তল-দার বাড়ি বলে তোমাকে থানায় নিয়ে তুলবে। খুব সাবধান!

থানায় মহানন্দ নিয়ে যায় নি, নিরু নিজে গিয়েছিল। বোকা মেয়ে! সেই যে কবে কুন্তল-দার দু-ছত্র লেখা দিয়েছিলাম, তারই সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে। তার পর গয়না-চুরির জন্য রাগের মাথায় ডায়েরি করে এসেছে মহানন্দের নামে।

নিরু বলে, বেশ করেছি। দেশের কথা বলে আর সেই সঙ্গে অত বড়লোকের নাম জড়িয়ে মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়, ওর শাস্তি হবে না?

কুন্তল-দা বললেন, ওর আগে হত তোমারই। টের পেতে যদি ঠিক সময়ে খবরটা না পেতাম—

নিরু আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি বলতে লাগলেন, ডায়েরি করে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরলে। এনকোয়ারির সময় মহানন্দ ওদিকে সত্য-মিথ্যা একরাশ বলে মনের ঝাল ঝেড়েছে। ভাগ্যিস খবর এসে গেল, হিরণকে দিয়ে তাই তোমায় গ্রেপ্তার করে এনেছি। তোমার বাড়িতে এতক্ষণ তোলপাড় চলছে।

আজ দিন তিনেক কুন্তল-দা একেবারে চৌকাঠ পার হন নি, অথচ খবর ঠিক ঠিক এসে যাচ্ছে। ইদানীং আর আমরা এতে আশ্চর্য হই না। তিনি বলতে লাগলেন, গ্রেপ্তার—বুঝলে তো নিরু? হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি—তোমার আর কোথাও যাওয়া হবে না।

নিরু মৃদু কণ্ঠে বলে, সবে ভাইয়ের জন্য আমি খাবার করতে বসেছিলাম। আজ ঠাকুর আসে নি কিনা!

ও-সব ভেবো না। তোমার ভাইয়ের খাবারের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু তোমার কি বন্দোবস্ত করি বল তো? বড্ড ভাবিয়ে তুললে।

নিরু রইল চিলেকোঠায়, আমরা ক'জন দোতলায়।

পরদিন নিরু জিজ্ঞাসা করে, কদ্দিন আটকে রাখবেন কুন্তল-দা?

কুন্তল-দা বললেন, দু-বছর, দশ-বছর, হয়তো বা চিরকাল—

অধীর কণ্ঠে নিরু বলে, সে আমি পারব না। ভাবছেন কেন, কোন চার্জ তো নেই—আর আমার কাছ থেকে কথা বের করবে, সে মানুষ ভূ-ভারতে জন্মায় নি।

কুন্তল-দা বললেন, তা পারবে না জানি।···কিন্তু কোন দিন যদি শুনি, তুমি বিষ খেয়েছ! তোমার মতো মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারি নে—কিছুতে না। তুমি বোঝ না, তোমার দাম অনেক।

আরও দিন-দশেক কেটেছে। ইতিমধ্যে কিছু কালের মতো ঐ বাড়িরও আস্তানা গুটাবার আবশ্যক হয়ে পড়ল। কুন্তল-দা বলছিলেন, যত মুশকিল তোমাকে নিয়ে বোন। স্ত্রী হয়ে কারও অন্দরমহলে ঢুকে পড় দিকি। তা হলে নিরাপদ।

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, না।

কেন?

এমন মানুষ কে আছে, যাকে স্বামী বলতে শরমে বাধে না?

শোন একবার দাম্ভিক মেয়েটার কথা! আবার কুন্তল-দা তার কথাতেই সায় দিয়ে গেলেন, তা সত্যি। কিন্তু সত্যিকার স্ত্রী হতে যাবে কেন? সাজতে হবে—যেমন যাত্রা-থিয়েটারে করে থাকে—

খিল-খিল করে হেসে নিরুপমা বলে, তাই বলুন। তা পারব, খুব

পারব। বলেন তো এই শঙ্কর-দারই স্ত্রী হয়ে ঘোমটা দিয়ে বসি।··· দাঁড়ান শঙ্কর-দা, শুনুন—কথাটা শুনে যান।

আঃ নিরু! সে সময়টা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। নিরু হাসতে হাসতে পথ আটকাল, তার পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

সমস্তটা দিন বড় খাটনি গেল। সন্ধ্যার পর ফিরেই শুয়ে পড়েছি। নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ মাথা ধরে জোরে জোরে নাড়া দিচ্ছে।

কে?

বউ, আপনার বউ গো—

প্রথমটা বুঝতে পারি নি, ঘোমটা-টানা কি না। কথাও বলছে ফিসফিস করে নববিবাহিত লজ্জাবতী বউটির মতো। শেষে চিনলাম। ঘুম এমন এঁটে এসেছে যে চোখ মেলতে পারি নে। বিরক্ত হয়ে বললাম, তা এ রাত্রে কেন?···না নিরু, বড্ড জ্বালাতন কর তুমি। বউ হও, যা হও—কাল দেখা যাবে। এখন যাও, বিরক্ত কোরো না।

কুন্তল-দার হুকুম, এক্ষুনি—

সত্যি?

শুভস্য শীঘ্রম্। নইলে কালই হয়তো শুনবেন, দ্বীপান্তরে নিয়ে গেছে। তখন বউ পাবেন কোথায়—বানর খুঁজে বেড়াতে হবে আন্দামানের সাগর বাঁধবার জন্য।

খুঁজতে হবে না, সে তো এই সামনেই! ঘুমন্ত মানুষ বলে করুণা নেই, রাত দুপুরে এসে আঁচড়াতে লেগেছ।

অভিমানের স্বরে নিরু বলে, মুখের উপর এ রকম বললে দুঃখ হয় না বুঝি! সত্যি কি আমি বানরের মতো দেখতে? বলুন।

দেখে বলতে হলে তো চোখ মেলতে হয়। উপায় কি? তা ছাড়া

কুন্তল-দার নাম করেছে। চেয়ে দেখি, সে তৈরী। বাইরে অপেক্ষমান কুন্তল-দা। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিলাম। আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। স্তিমিত গ্যাসের আলো। কুন্তল-দা খানিকটা সঙ্গে গিয়ে ফিরে চলে এলেন। দু-জনে নিঃশব্দে চলেছি।

ভাল চাকরি হল আমার! নিরুকে অন্দরবর্তী করে স্বামী-পরিচয়ে আছি, দূর-দূরান্তরে যাবার হুকুম নেই। একদিন কুন্তল-দা এলেন। নাছোড়বান্দা হয়ে ধরলাম, মানুষের জেল হয়—দু-মাস হোক ছ-মাস হোক তার একটা মেয়াদ থাকে। আমার মুক্তি কবে হবে বলুন?

হল কত দিন?

রাগ করে বলি, দেখ না হিসাব করে। তিন মাস পুরে গেছে। টবের গাছ আলগে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

আমার ভাব দেখে কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসেন। বলেন, আচ্ছা—থাক আর ক'টা দিন। দেখি আর কাউকে।

কাউকে পাবে না আমার মত গাধা কি দুনিয়ায় আর একটা আছে?

যেখানে থাকতাম, সেটা আধ-শহরগোছের একটা জায়গা। সেদিন সন্ধ্যা থেকে বড় ঝড়বৃষ্টি। অনেক রাত্রে দরজার শিকল ঝনঝনিয়ে উঠল। নিরু ডাকছে। কি ব্যাপার? দরজা খুলে দেখি, তার হাতে হেরিকেনের আলো, কাঁখে ঝুড়ি। বলে আমাদের পিছনের বাগানে বিস্তর আম পড়েছে, শঙ্কর-দা। চল কুড়িয়ে আনি।

রাগের সীমা রইল না। বললাম, হ্যা—এই সমস্ত করে বেড়াই; কাল থেকে তুমি কোমর বেঁধে কাঁচাআমের আমসি করতে লেগে যাও। আর বল তো গোয়াল বেঁধে দু-চারটে গোরু পুষবার বন্দোবস্ত করি।

তার হাসিমুখ মুহূর্তে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। হেরিকেনের ক্ষীণ আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পায়ের নখে মেঝেয় দাগ দিতে দিতে সে বলে, আমি কি করব বলুন? আমার কি দোষ?

দোষ কারও নয়। চুপ করে শুয়ে থাকগে। কাটা ঘায়ে নুন দিতে এস না, এইটুকু দয়া কর। এ রকম থাকতে তোমার ফূর্তি লাগছে, আমার কান্না পায়।

ঝুড়িটা ধপ করে নামিয়ে রেখে নিরু ফিরে চলল। বলে, আপনি চলে যান, কালই—বুঝলেন?

আমি বললাম, তোমার কথায় এখানে আসিনি নিরু, তোমার কথায় যেতেও পারি নে। যাঁর হুকুমের দরকার, তাঁকে জানিয়েছি। ছাড়া পেলে এক মিনিটও দেরি করব না।

তা হলে আমিই যাব কাল। আর একটা দিনও নয়। কুন্তল-দা দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেও না।

দরজার সমনে গিয়ে সে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে, ফুর্তির কথা বলছিলেন, খুব ফুর্তি দেখছেন! দেখবার চোখ কি আছে আপনার? আমিই কি এ জীবন চেয়েছিলাম? মনের ভুলে একটুখানি হেসে ফেলেছি, মাপ করবেন।

দড়াম করে সে দরজায় হুড়কো এঁটে দিল।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিরুর কথাগুলো বার-বার মনে আসছে, তার বিষণ্ণ চেহারাটা যেন চোখে দেখছি। গৃহস্থ-ঘরের ভাবপ্রবণ মেয়ে, লেখাপড়া শিখছিল, তারপর দেশের কাজ করবে বলে সর্বস্ব ছেড়ে চলে এসেছে। এই নির্বান্ধব পুরী তার বুকে পাথর হয়ে চেপে থাকে। সমস্ত দিন আর দশটা বউ-ঝির মতো ঘরের কাজে নানা রকম ফাইফরমাস মুখ বুজে খাটে। নিষুতি রাতে অভিনয়ের খোলসটা একটু খুলতে

চেয়েছিল, ছুটোছুটি করে আম কুড়োত, হাসত, আবোল-তাবোল বকত খানিকটা···কি এমন অপরাধ যে, এত কথা শুনিয়ে দিলাম, বেচারি মুখ চুন করে চলে গেল !

শুয়ে থাকতে পারি নে, নিরুর ঘরের সামনে এসে ডাকাডাকি করলাম। সাড়া নেই। সাড়া পাওয়া যাবে না, জানি। ঝুড়ি নিয়ে একলা বেরুলাম। সকালে রাগ পড়ে যাবে, ঝুড়ি-ভরতি আম দেখে খুশি হবে সেই সময়। তখন বাতাস থেমেছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। আমার এক পিসতুত বোন জয়া-দিদির কথা মনে পড়ছিল। ছোটবেলায় পাঠশালা পালিয়ে তাঁর সঙ্গে ছুটোছুটি করে আম কুড়োতাম। সে-সব দিন কোথায় চলে গেছে! আজ আমি শঙ্কর রায়, দলের ছেলেমেয়েদের অতি শ্রদ্ধেয় শঙ্কর-দা—গভীর রাত্রে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, এ দৃশ্য কেউ দেখলে কি রকম ব্যাপার হবে আন্দাজ কর তো !

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। নিরুর সামনে পড়তে সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ছিলেন রাত্রে ?

কেন, ঘরে। এই তো উঠে আসছি।

সে হয়তো শেষ রাতে কখন এসে শুয়েছেন। আমি একবার উঠে ছিলাম। দেখি, দুয়োর হাঁ-হাঁ করছে।

হাঁ, তা বটে। কিন্তু বেশ ছিলাম হে—অত্যন্ত আরামে...মানে, স্প্রিঙের খাটে শুয়েছ তো, যেন গিলে খায়—

নিরু শান্তভাবে বলে, কোন জায়গায় ?

চটপট মিথ্যে বানিয়ে বলা অভ্যাস করে আয়ত্ত করেছি, কিন্তু নিরুর সামনে কথা আটকে যায়। বললাম, ছিলাম গলির মোড়ের বাড়িটায়।

করব কি···কাপড় ভিজে গেল, ওদের কাছ থেকে একটা শুকনো কাপড় চেয়ে নিয়ে—

বাড়িটা কার, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছি।

রাগ করে বলি, কার বাড়ি-কি বৃত্তান্ত, মুখস্থ করে আসি নি। অতশত বলতে পারব না।

নিরু বলে, আমি পারব। ছিলেন রান্নাঘরে। কাপড়ের ট্রাঙ্ক আমার ঘরে কিনা—তাই উনুনে কাঠ দিয়ে আগুন করেছেন, ভিজে কাপড় বসে বসে গায়ে শুকিয়েছেন। আমাকে ডেকে কাপড় চাইলে কি অপমান হত?

আবার বলে, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হব। আপনি কি যাবেন কলকাতা অবধি?

আমি বললাম, যাওয়া যাওয়া করছ, কি এমন বলা হয়েছে শুনি? মন খারাপ হলে মানুষে কত কি বলে! এই নিয়ে কুন্তল-দার কাছে একশ'খানা করে লাগাবে তো।

কিচ্ছু বলব না কুন্তল-দাকে। আপনি না যান, একাই চলে যাব। তিলে তিলে আপনাকে মেরে ফেলতে চাই নে—

আমি বললাম, তা বই কি! স্বাধীন হয়ে গিয়েছ, কুন্তল-দাকে বলবে কেন?···কিন্তু ঝগড়া পরে কোরো। আমি দাঁড়াতে পারছি নে, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। কুইনাইনের বড়ি থাকে তো শিগগির গোটা দুই বের করে দাও, জ্বর আসতে পারে।

কুইনাইনে জ্বর ঠেকাল না। সেই যে গিয়ে শুয়ে পড়লাম, অনেক দিনের খবর জানি নে। অসুখের মধ্যে এমন অসহায় মানুষ! মাসখানেক পরে এক দিন কেউ কোথাও নেই, খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছি।

লক্ষ্য দেয়াল অবধি—ঐ দেয়ালে যেখানে বালির জমাট উঠে অনেকটা মানুষের মুখাকৃতি হয়েছে, ঐ জায়গা আমি ছোঁব। ঠিক পারব।··· পারছি, হাঁ—হাঁটতে তো পারছি। ওঘরে পায়ের শব্দ। রুগ্নকণ্ঠ উল্লাসে জোরালো হয়ে ওঠে, নিরু, দেখ···নিরুপমা—

নিরু জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখে।

একি কাণ্ড আপনার ?

হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। নিরু ছুটে এল। আমাদের দলের এক ছোকরা ডাক্তারি পাস, তাকে এনে রাখা হয়েছিল, সে এল। একটু পরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। নিরু তখনও আছে। বড় কড়া শাসন তার আজকাল। বার-বার মিনতি করে বলি, লক্ষ্মী নিরু, খেতে দাও একটা আম। কাঁচা আম কুড়োতে গিয়ে এই দশা। এখন পেকেছে, টুকটুকে আম ঝুড়ি ঝুড়ি ঘরে রয়েছে, মিষ্টি দেখে বেছেগুছে একটা দাও, কিচ্ছু হবে না।

নিরু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তা বই কি ! ডাক্তার কি বলেছে জানেন ?

কিচ্ছু বলে নি, তোমার বানানো কথা। আমাকে খেতে না দেবার ষড়যন্ত্র।

নিরু তর্ক করে না। বলে, বেশ, তাই—

নির্বিকার মুখে সে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে শিকল পড়ল।

দুয়োরে শিকল দিলে যে ?

বাইরে থেকে নিরু বলে, এঘরের এত আম তো চট করে সরানো যাবে না। আপনাকে আটকে রাখাই সোজা।

কে তোমাকে মাতব্বরি করতে বলে ? তুমি কে ? আমার আপনার কেউ নও—

নিরু জবাব দেয়, আমি আপনার কেউ, তা বলেছি কোনদিন ?

তুমি শত্রু, আমাকে মেরে ফেলবার মতলব তোমার।

বেশ, তাই। ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন তো—আমি বার্লি চড়িয়ে আসি।

ঝগড়াঝাটির ক্লান্তিতে চোখ বুজে পড়ে আছি। কুন্তল-দার গলা শুনতে পেলাম। তিনি আজ এসেছেন বুঝি, ও ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে। কুন্তল-দা বলছেন, ঢাকার ব্যাপারে আর দেরি করা চলে না বোন। শঙ্কর কাল অন্নপথ্য করছে, আর কি! দু'টি ছেলেকে আমি এখানে পাঠিয়ে দেব, তারা দেখাশুনো করবে।

না, না—আর কয়েকটা দিন ছুটি দিন আমাকে···এই দিন দশেক। ভাত খেয়ে কেমন থাকেন, না দেখে যাই কেমন করে ?

মুশকিল, এই ক'দিনের জন্য আবার একজনকে পাঠাব ?

তাই করুন, দাদা। তারপর আমি গিয়ে পড়ব, সমস্ত ভার মাথায় তুলে নেবো—

কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি নিরু, সাবধান! তুমি জান না বোন, তোমার কত দাম। তোমায় ছাড়তে পারব না, শঙ্করের খাতিরেও না।

রাগ জল হয়ে গেল। মনে আনন্দের তুফান উঠছে। সত্যি, অসুখের মধ্যে মন এমন দুর্বল হয়ে যায়! আধঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, যেন অনেক দূর থেকে মিষ্টি গান ভেসে আসছে। বিশ্বাস কর ভাই, বাড়িয়ে বলছি নে, সেদিন কত কি ভাবতে লাগলাম! যেন পৃথিবী থেকে দুঃখ-দৈন্য চলে গেছে, মানুষ অনন্ত শান্তিতে রয়েছে। সাম্রাজ্য নিয়ে হানাহানি—সে যেন অতীত যুগের বিভীষিকা।

শিকল খুলে কুন্তল-দা দেখতে এলেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

দেখুন অত্যাচার। একেবারে কয়েদ করে রেখেছে।

সামান্য দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করে কুন্তল-দা উঠলেন। বড় ব্যস্ত। দুটো খেয়ে তখনই চলে যাবেন। বালির বাটি হাতে নিরুপমা এল। বললাম, নিরু, আমরা চেয়েছি পৃথিবীকে ভালো করে ভোগ করব।

নিরু বলে, বেশ তো, তাই করবেন।

কাছে আসতে হাত ধরে ফেললাম নিরুপমার।

দেখ, নাগা সন্ন্যাসী আমরা নই, নিবৃত্তির সাধনা আমাদের নয়।

আমার চোখে কি ছিল, এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে হাসিমুখে নিরু সায় দেয়, হুঁ হুঁ—

আমাদের দু-জনের বিয়ে হোক।

বেশ।

তাহলে কুন্তল-দা যাবার আগে তাঁকে বলো।

আচ্ছা। বলে নিরু চলে গেল। একটু পরেই ফিরল। হাতে আইস-ব্যাগ।

কুন্তল-দা আসছেন। ডাক্তারকে খুঁজলাম। তিনি নেই।

ডাক্তার?

নিরু বলে, শুয়ে পড়ুন দিকি। আপনার মাথায় আইস-ব্যাগ বসিয়ে দিই—

কেন?

মাথা ঠাণ্ডা হবে। মাথার ব্যারাম না হলে অমন আবোল-তাবোল কেউ বকে?

কুন্তল-দা আসতে নিরুপমা বলল, এ গাড়িতে যাওয়া হবে কি করে? পরেরটায় যাব। একটু গুছিয়ে নিতে হবে, 'ওঠ্' বললে মেয়েমানুষের যাওয়া কি করে চলে।

তুমি যাচ্ছ তা হলে?

হ্যাঁ, কালই ঢাকায় চলে যাই, তার পর আর যেখানে যেতে বলেন।

আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, আর ক'টা দিন থেকে যাও নিরু। আমার রোগ এখনও সারে নি।

নিরু বলে, আমি থাকলে বেড়েই চলবে।

দেখ, যদি মরে যাই।

বড্ড দুঃখ হবে। আহা, গালি দেবার আর ঝগড়া করবার এমন মানুষটাও চলে গেল!

কাল আমি অন্নপথ্য করব। এই একটা দিনও থাকতে পার না?

না।

যাবার আগে নিরু প্রণাম করতে এল। আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম। সে পায়ের গোড়ায় মাথা রাখল। আমি পা সরিয়ে নিলাম। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি জলের দাগ। নিরুপমা কেঁদেছে। ও মেয়েও কাঁদতে জানে তা হলে!

ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম। গাড়ির মধ্যে নিরু আর কুন্তল-দা সামনাসামনি বসে চলেছেন। তেঁতুল গাছের আড়ালে গাড়ি অদৃশ্য হল। আওয়াজও কানে আসে না…

## সোমনাথ ও মায়া

জগৎ দত্তর কথা নিয়ে মহাকাব্য লেখা যায়। কিন্তু লিখছে কে? লেখার যেদিন সময় হবে সেদিন অতীতের সাক্ষী আমরা যে ক'জন আছি, আমাদের শক্তি থাকবে কি? আমরা বেঁচে থাকব তো? এখনই স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন দুপুরে কালীসিংহের মহাভারতখানা নামিয়ে নিয়ে

বসেছিলাম। এত পড়াশুনো ছিল বাবার, তার মধ্যেও এই বই তিনি নিয়মিত পড়তেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে তাকের উপর তোলা ছিল। পাতা উলটাতে উলটাতে তার মধ্যে পেলাম, পুরানো কয়েক টুকরা খবরের কাগজ—আলপিনে গাঁথা, এখানে সেখানে লাল কালির দাগ দেওয়া। মনে পড়ে গেল, আমিই এই সব টুকরো কেটে রেখে দিয়েছিলাম। কোন্ বিস্মৃত যুগের কথা, সে সব মানুষ নেই, সে পৃথিবী নেই, কাগজ বিশ্রী বিবর্ণ হয়ে গেছে, পড়াই মুশকিল।

জজ এজলাসে আসিয়া বসিলেন। রায় কি দিবেন, পূর্বাহ্ণেই অনুমান করা গিয়াছিল। কিন্তু আসামী জগৎলাল কাঠগড়ায় চেয়ারের উপর নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায় বসিয়া আছে। আলস্যে মাঝে মাঝে তাহার তন্দ্রাবেশ হইতেছে, এইরূপ একটি ভাব।

বহু বাগাড়ম্বরের পর হুকুম জানিতে পারা গেল, ফাঁসি। জগৎ হাসিমুখে জজকে নমস্কার করিল। জজ বলিলেন, আপনি আপিল করিতে পারেন। দরকার নাই, বলিয়া জগৎ প্রবল হাস্য করিতে লাগিল।

মল্লিকা এসেছে, আমার কাঁধের উপর ঝুঁকে সে-ও পড়ছিল। বলে উঠল, ধন্য!

তার মুখের দিকে তাকালাম। এই ধরনের কথা শুনলে সচরাচর আমি হেসে উঠে তাকে অপ্রতিভ করি। কিন্তু আজ পারলাম না। মনে পড়ল, আমি আর কুন্তল-দাও সেদিন আদালতের এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। জগতের হাসি দেখে সেই পাথরের মানুষটি পর্যন্ত অস্ফুট স্বরে মল্লিকারই মতো ঐরকম একটা কি বলেছিলেন।

মল্লিকা বলে, ওঃ, কুন্তল-দার দলের ছেলে!

জগতের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাই। দায়ে পড়ে সংক্ষেপে-করা

কাহিনীর মধ্যে না-ই বা তাকে আনলাম। বললাম, এর চেয়েও তার বড় পরিচয় আছে। জগতের বাবা হলেন সোমনাথ দত্ত।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে মল্লিকা বলে, বল কি ? হাত জোড় করে সে নমস্কার করল।

তুমি তাঁকে দেখেছ নাকি, মল্লিকা ?

মল্লিকা বলে, না। কিন্তু ভগবানকেও তো দেখি নি।

ভগবান নিয়ে টানা-হেঁচড়া কেন ?···সে আমলে লোকে ওঁদের সম্বন্ধে কি বলাবলি করত, জানো ?

কি ?

সব ভয়ঙ্কর বাঘের দল। হাসতে হাসতে ঐরকম যারা প্রাণ নিয়ে খেলা করতে পারে, তারা কক্ষনো মানুষ নয়।

মল্লিকা বলে, হাসতে হাসতে একদিন যারা এতবড় দেশটার সর্বনাশ করেছিল, তারাও মানুষ ছিল না। ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভয়ঙ্করই হয়ে থাকে।

বারান্দায় গিয়ে বসেছি। উঠানের ওপারে রাস্তা, তার ওদিকে মাঠ···কাশের সাদা ফুলে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। খর রৌদ্রে হঠাৎ চোখে ধাঁধা লাগে, মনে হয় সামনে দুস্তর বালু-সমুদ্র।

মল্লিকা এসে পাশে আলসের উপর বসল। বলে, সোমনাথকে দেখেছ তুমি ?

কত ! প্রথম দেখি, জগতের বিয়ের দিন। বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে আছি, জগৎ বাসরঘর থেকে পালিয়ে এলো সেখানে—

নাছোড়বান্দা মল্লিকা, তার তাগিদে স্মৃতির সাগর মন্থন করতে হয়। নিজে আর কতটুকুই বা জানি, মায়ার মুখে যেমন যেমন শুনেছি, সেই

রকম বললাম। মায়া আমার মামাতো বোন, খালিশপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে ওদের বাড়ি। কলেজে ঢুকে গোড়ায় জগতের সঙ্গে হস্টেলের এক ঘরে পাশাপাশি থাকতাম। কুন্তল-দার হুকুমে রাত দুপুরে হস্টেল পালিয়ে কতবার ভৈরব পাড়ি দিয়েছি। একবার ডিঙি ডুবে গেল, সাঁতরে ওপারে উঠে জগতের প্রতীক্ষায় ভোরবেলা অবধি চাঁদাকাঁটার ঝাড়ের পাশে বসে হি-হি করে কেঁপেছিলাম। জগৎ টানের চোটে দু'বাঁক এগিয়ে গিয়ে উঠেছিল। এর থেকে মোটামুটি বুঝতে পারছ, আমাদের বন্ধুত্বটা ছিল কি রকম। আমাদের সঙ্গে সে মায়াদের বাড়িতে অনেকবার গিয়েছে। আর এরই প্রায় বছর দুই আগে থেকে সোমনাথ ফেরারি ছিলেন। কাজেই তার অভিভাবক সে নিজেই। জুৎ হয়ে গেল। আমি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলাম।

মল্লিকা মুখ ঘুরিয়ে বলে, তুমি উপলক্ষ। যোগাযোগ নিজেরাই করেছিল। ভালবাসার বিয়ে, বুঝতে পারছি।

সে যাই হোক, শুভকর্ম তো নির্বিঘ্নে হল। পাড়াগাঁয়ের বিয়ের ব্যাপারে সাধারণত যত রাত্রি হয়ে থাকে, এখানে হাঙ্গামা চুকেছিল তার অনেক আগে। তার কারণ, মায়ার বাবা কলকাতায় এক জমিদারের বাড়ি চাকরি করতেন, সেখান থেকেই রসুয়ে বামুন এবং খাটনির লোকজন নিয়ে এসেছিলেন, গাঁয়ের লোকের উপর নির্ভর করেন নি। মাঘ মাসের শেষ, দারুণ শীত পড়েছে, বাড়িসুদ্ধ সবাই লেপের নিচে ঢুকেছে, বিয়েবাড়ি বলে বুঝবার জো নেই।

মায়ার ঘুম আসছিল না। কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর মল্লিকা—তা হলে আমাদের বিয়ের দিনটা মনে করে দেখ। দেশসেবক বলে সবাই হৈ-চৈ করে বেদির উপর বসায়, কিন্তু ভেবে দেখ ঘরোয়া ব্যাপারে

সবাই আমরা এক রকম। তুমি উসখুস করছিলে, বললে, সেণ্ট পড়ে চোখ জ্বালা করছে—আমি তখন—

মল্লিকা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। বলে, হচ্ছে ভাললোকের কথা। ওর মধ্যে ঐসব ছাই-ভস্ম আনছ কেন বলো তো?

তারপর একটু ঘুমের আবিল এসেছে মায়ার। কাপড়ে টান পড়ায় সে চমকে উঠল। দেখে, জগৎ চুপিচুপি গাঁটছড়া খুলে ফেলছে। দরজা খুলে জগৎ সন্তর্পণে চোরের মতো বেরুল। মায়ার বড় ভয় করে, বাসরঘর থেকে এ রকম বেরুনো অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত অলক্ষণের কথা। মায়ার চোখ ফেটে জল আসে আর কি! জগৎ গেছে তো গেছে, ফিরবার নামটি নেই। অনেকক্ষণ পরে পায়ের শব্দ পেয়ে মায়া চোখ বুজল, ঠিক যেন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে।

কুলুঙ্গিতে রেড়ির তেলের দীপ জ্বলছিল। মায়া চোখ মিটমিট করে দেখে। জগৎ শোয় না, একটু ইতস্তত করে, তারপর মায়ার গা ধরে নাড়া দেয়, শোন···ওঠো তো একটিবার—

কপট ঘুম ভেঙে মায়া বলে, কি?

কিছু খাবার এনে দিতে পার, লক্ষ্মীটি?

বিয়ের রাতে এই তাদের কথা। মায়া বলে, কোথায় পাব? সব রয়েছে ভাঁড়ারে চাবি দেওয়া। আর লোকে দেখলেই বা বলবে কি?

জগতের মুখের দিকে চেয়ে সে ফিক করে হেসে উঠল। বলে, খাবারের চেষ্টায় রান্নাঘরে গিয়েছিলে নাকি? যেমন লাজুক, এইবার টের পাও! থালা ভরে এত যে খাবার দিয়েছিল, কিছু খাও নি বোধ হয়।

জগৎ বলে, ঠাট্টা নয় মায়া, সত্যি বড় দরকার। ভাঁড়ার হোক, যে জায়গা হোক—তুমি না পারো, ঘরটা শুধু দেখিয়ে দিয়ে এস।

তার ভাব দেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মায়া বলে, হয়েছে কি ?

বাবা এসেছেন।

কোথায় তিনি ?

জগৎ বলে, আশীর্বাদ করবেন বলে এসেছেন। কেউ জানতে না পারে, খবরদার !

মায়া বলে, সে জানি। কিন্তু বাইরে কোথায় তাঁকে রেখে এলে এই শীতের মধ্যে ? ওঁর কষ্ট হচ্ছে।

ম্লান হেসে জগৎ বলে, লেপ-কাঁথা শাল-দোশালা নিয়ে পুলিশ তো দিনরাতই ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগাল পাচ্ছে না বলেই এত কষ্ট !

•

অন্ধকারে আতাতলায় দাঁড়িয়েছিলেন সোমনাথ। নিঃশব্দ রাত্রি, কনকনে বাতাস বইছে, আকাশের তারাগুলোও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। অযত্নে অত্যাচারে বয়সের চেয়ে অনেক বুড়ো দেখায় সোমনাথকে। খালি গা, সাজ-পোষাকের মধ্যে একটা তূলোর জামা আর সূতি চাদর।

মায়া গড় হয়ে প্রণাম করল। বলে, আসুন বাবা !

সোমনাথ চমকে উঠলেন। এই রকম ভাবে মায়া চলে আসবে, তিনি প্রত্যাশা করেন নি। বললেন, অভ্যর্থনা করতে এসেছ· বোকা মেয়ে, আর সবাইকে ডেকে তুলেছ নাকি ?

কাউকে ডাকি নি, বাবা। সে বুদ্ধি আছে। ঘরের মধ্যে চলে আসুন ; কেউ টের পাবে না।

আমায় ঘরে নিলে বিপদ আছে, জানো ?

মায়া বল্লে, ফাঁকি দিলে শুনব না। আঁধারে আপনাকে দেখতে পেলাম না, আলোয় নিয়ে দেখব, প্রাণ ভরে পায়ের ধুলো নেব বাবা।

হাত ধরে সে সোমনাথকে ঘরের ভিতর নিয়ে এল। চুপি-চুপি জগৎকে বলে, সত্যি—খাওয়ানোর কি করা যায় বলো তো ?

জগৎ বলে, তোমাদের ঘর-বাড়ি, তোমরা যদি না পার···আমি হলাম নতুন মানুষ, তার উপর জামাই—

মায়া বলে, আমিও তো এই দিন চার-পাঁচ কনে হয়েই আছি। কোথায় কি রেখে দিয়েছে, আমার সঙ্গে যুক্তি করে তো করে নি, কোথায় এখন খুঁজে বেড়াই ?

একটুখানি ভেবে মায়া বলল, এক কাজ করতে পার ? শঙ্কর-দাকে তুলে নিয়ে এসো। তিনি সমস্ত জানেন, তিনি উপায় করতে পারবেন।

মল্লিকা বলে, তখনই তোমার ডাক পড়ল ?

ডাক কি বলছ। দিব্যি আয়েশের ঘুম ঘুমোচ্ছি, জগৎ এসে পিঠের উপর দমাদম ঘুসি চালাতে লাগল। বলে, ওরে হতভাগা, বাবাকে দেখবি তো চলে আয় শিগগির।

মল্লিকা বলে, তার পর ?

ভাঁড়ার জগুকাকার হেপাজতে। ভিয়েন-ঘরে চৌকির উপর পড়ে তিনি নাক ডাকাচ্ছিলেন। পৈতের বাঁধা চাবির গোছা, সাফাই হাতে সরিয়ে নেওয়া গেল। মিষ্টি-মিঠাই প্রায় শেষ, হাঁড়ি তিন-চার মুখে নেকড়া বেঁধে চালির উপর তোলা ছিল ফুলশয্যার তত্ত্বের জন্য। তাই থেকে কিছু মায়াকে এনে দিলাম। সযত্নে শ্বশুরের সামনে সে রেকাবি সাজিয়ে দিল।

গল্পে গল্পে জানা গেল, তিন দিন খেজুর-রস আর পুকুরের জল ছাড়া

আর কিছু জোটে নি সোমনাথের। কতক্ষণ ধরে কত রকমের কথাবার্তা হল। খালে জোয়ার এল। জেলেদের নৌকা ছাড়বার উদ্যোগ হচ্ছে, তারই সাড়া-শব্দ আসছে, সেই সময় তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মায়া বলল, উঃ, কি কনকনে বাতাস! যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ বললেন, ভারী তো! এর চেয়ে কত ঝড়-বাতাস মাথার উপর দিয়ে গেছে, জানো?

কিন্তু কেন যায়, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মৃদু হেসে সোমনাথ বলেন, আমার এমনি সব মায়াবিনী মা-লক্ষ্মীদের গায়ে যাতে একটা ঝাপটাও কোনদিন না লাগে, সেই জন্য।

আমার দিকে তাকিয়ে মায়া বলে, বাইরে কি রকম অন্ধকার, দেখছ শঙ্কর-দা?

সোমনাথ বললেন, সেই তো ভাল মা, আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে দিব্যি চলে যাবো, কেউ দেখতে পাবে না।

তিনি চলে গেলেন। তার পর কি হল মায়ার, আর শুতে যায় না, জানলার ধারে বসে রইল সেই বিয়ের কনে। আমি আর জগৎ খাটের উপর বসে আছি, আমাদের বলবার মতো কথা জোগাচ্ছে না। খানিকটা পরে বাইরে চলে এলাম।

পরদিন মায়ার মুশকিলটা একেবার বুঝে দেখ, মল্লিকা। এই সব ব্যাপারে সমস্ত রাত ঘুম হয় নি—তার উপর মশার উৎপাত, মুখখানা রাঙা করে দিয়েছে। বেচারা যেখানে বসে, সেখানেই চোখ বুজে ঝিমিয়ে পড়ে। মায়ার মা অর্থাৎ আমার মাসিমা পর্যন্ত মুখ টিপে হেসেছিলেন, আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কিছুই তো খুলে বলা চলে না।

মল্লিকা কিন্তু আমার এসব শুনছিল না, সে খবরের কাগজের আর একটা টুকরো নিয়ে পড়তে শুরু করেছে—

গতকল্য জগৎলাল দত্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, হুকুমের পরও তাহার দেহের ওজন বাড়িতেছিল। ফাঁসির পূর্বরাত্রেও সে নাকি অকাতরে ঘুমাইয়াছিল। সকাল বেলা জেলের কর্মচারী তাহাকে ডাকিতে গিয়া দেখেন, সে তখনো নিদ্রাচ্ছন্ন। অনেক ডাকাডাকির পর সে লজ্জিত স্বরে কহিল, "সময় হইয়া গিয়াছে বুঝি! আমার একটু গীতা পড়িয়া লইবার ইচ্ছা ছিল, তাহা আর হইল না। আচ্ছা চলুন—"

তাড়াতাড়ি সে গেঞ্জি গায়ে দিল। চশমাটি মুছিয়া সে চোখে দিল, তারপর হাসিতে হাসিতে চলিল, যেন নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছে।

অপরাহ্ণে জেলের ফটকে বিপুল জনতা হইল। জগৎলালের দূর সম্পর্কের এক খুড়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিলেন। শোভা-যাত্রা সহকারে উহা শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। চিতাভস্মের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ঐ রাত্রে নাকি বহু গৃহে অরন্ধন-ব্রত পালিত হইয়াছিল।

জগৎলালের বৃদ্ধ পিতা ও স্ত্রী এখন কাশীধামে আছেন। কর্তৃপক্ষ সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা কলিকাতা আসেন নাই।

মল্লিকা মন্তব্য করে, বাজে কথা। বয়ে গেছে ওদের খবর দিতে।

আমি নিজেও মায়ার নামে তার করেছিলাম মল্লিকা, যদি দেখাটা হয়। সমস্ত চুকে বুকে গেল, কেউ এল না। তারপর পেলাম মায়ার এক চিঠি, আমাকে বিশেষ করে যেতে লিখেছে। গিয়ে দেখি, আর এক তাজ্জব।

মল্লিকা বলে, কি ?

মায়ার সিঁথিতে সিঁদূর, পরণে শাড়ি, হাত-ভরা সোনার চুড়ি ঝিকমিক করছে।

বলো কি !

সত্যি কথা।

অস্ফুট স্বরে মল্লিকা বলল, বেহায়া—

কে বেহায়া ? মায়া ?

মল্লিকা রাগতভাবে বলল, অমন স্বামী—শেষদেখা দেখতে এল না। তার উপর ঐরকম ভাবে অন্তত তোমার সামনে আসতে একটু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।

শুধু মল্লিকা নয়, সবাই তোমরা ঠিক ঐ কথাই বলবে। কি বলো ভাই ? আচ্ছা, শোন শেষ অবধি।

বাঙালিটোলায় মায়াদের বাসা। গলির গলি, তস্য গলি। টাঙাওয়ালারও ঘণ্টা তিনেক লাগল খুঁজে বের করতে। বেলা তখন ন'টা এই রকম হবে। আমার দেখে সোমনাথ অবাক হয়ে গেলেন। আমিও দেখে চিনতে পারি নে। লোহার শরীর ছিল, শুকিয়ে কঞ্চির মতো হয়ে গেছেন; তামাক খাচ্ছেন আর খকখক করে কাসছেন।

হবে না ? ঐ তো একমাত্র ছেলে !

আমায় যে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছে, সে কথা মায়া সোমনাথকে জানায় নি। বললাম, আপনার নাকি ভয়ানক অসুখ কাকাবাবু ?

সোমনাথ বললেন, তাই লিখেছে বুঝি ! বুড়ো ছেলের মা কিনা, অল্পেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু তাকে দেখছি নে যে !

সোমনাথ বললেন, সিংহিদের মেয়েকে সেলাই শেখাতে গেছে। এসে তারপর রান্নাবান্না করবে।

গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, ভাল হয়েছে বাবা, এই ফাঁকে দুটো কথা বলে নিই তোমাকে। আমি বৌমাকে কিছু জানতে দিই নি। জানতে পারলে, একেবারে মরে যাবে। সে জানে, জগতের তিন বছরের জেল হয়েছে শুধু। তুমি টেলিগ্রাম করেছিলে, আমি তা দিই নি; গাপ করে ফেলেছি।

মল্লিকা সোয়াস্তি পেল। বলে, তাই বলো! নইলে জেনে শুনে মেয়েমানুষে ঐরকম অবস্থায় সেজে গুজে থাকতে পারে ?

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে সোমনাথ বলে উঠলেন, তারপর ?…শেষ হয়ে গেছে, সে তো জানি। বলো দিকি একটু সেই সব কথা। ভাল করে একটা নিশ্বাস ফেলবার সাহস হয় না বাবা, পাছে ধরে ফেলে। যে রকম চালাক মেয়ে বৌমা! সিংহিদের মেয়েটার সঙ্গে চলে গেছেন, বলো তো এই ফাঁকে।

আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি আর কথা বলতে পারি না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছি। সোমনাথ বলেন, কাঁদছ শঙ্কর ? ছিঃ! শোন তবে। আমার বড়দাদার দুই ছেলে, অমল আর কমল। বেকার অবস্থায় তিন বছর ঘুরে অমলের শেষে যক্ষ্মা হল, নিমতলার ঘাটে এখন শান্তি পেয়েছে। আর কমলও মরেছে; লেখাপড়া শিখেছিল, কিন্তু ভাত জোটাতে না পেরে গাঁজাগুলি খেয়ে বেঁচে আছে কোনখানে। আমার জগৎ তো এদের চেয়ে ভাল গেছে।

পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, এই নরম মাটির দেশে আপনার জগতের মতো ছেলে জন্মালো কি করে, তাই ভাবি কাকাবাবু।

সোমনাথ এই সময় ইসারা করতে লাগলেন, যেন আনন্দের অতিশয্যেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। সোমনাথের সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কাহিনী শুনেছ তোমরা, আমি নিজের চোখে এই একটা দেখলাম। মায়া ফিরে এসেছে। সোমনাথ বলতে লাগলেন, আমার কি এমন অসুখ বৌমা, শ্বশুরকে এতটা পথ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলে।…অবিশ্যি, একটা সুবিধা হল, জগতের সব খবর ওর নিজের মুখে শোনা যাবে। সেই সব কথাই ও আরম্ভ করেছিল।

মায়ার মুখ মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। বলে, কি কথা? কথাবার্তা থাকগে এখন।

আমি বললাম, শান্তিতে আছে সে।

সোমনাথ বলে দিলেন, আর তিন বছর জেল হবার সে খবরটা শুনিয়ে দাও।

মুখস্থ কথার মতো বললাম, রায় বেরিয়েছে—তিন বছর জেল।

আবার সোমনাথ হেসে উঠলেন। বুঝলে বৌমা, মোটে তিন বছর! ও তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

মায়াও হাসতে লাগল। বলে, তা ঠিক। তিন বছর আর ক'টা দিন! আপনি অমন কত তিন বছর তো আন্দামানে ছিলেন। তা হলে দেখুন বাবা, আমি গোড়া থেকে বলছি, মামলা নিয়ে এত যে হৈ-চৈ হল —

সোমনাথ বললেন, পর্বতের মূষিক-প্রসব; জজ একবর্ণও বিশ্বাস করল না। রায়ে কি বলেছে, শঙ্কর? সেই যে তুমি বলতে যাচ্ছিলে? শঙ্কর খাঁটি খবর রাখে, বৌমা।

মায়া বলে, তা তো বটেই। এক দলের ওঁরা। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কতকটা হুকুমের ভাবে বলে, রায়ের কথা পরে হবে দাদা। এতদূর থেকে এলে, আগে কলতলায় চলো, গায়ে যে এক ইঞ্চি ধূলো জড়িয়ে গেছে।

কোথায় ধূলো?···এসেছি কি এখন? হাত-পা ধুয়ে এসে বসেছি।

মায়া রাগ করে ওঠে।—বড্ড তর্ক কর, শঙ্কর-দা। ধূলো রয়েছে, নয়তো কি মিছে কথা বলছি? মাথার চুল অবধি ধূলোয় রাঙা হয়ে গেছে। এসো—

কলতলা সামনে, কিন্তু আমাকে মায়া বারাণ্ডা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে

যায়। বললাম, তোমার শ্বশুর একেবারে অথর্ব হয়ে গেছেন দেখছি, চলে ফিরে বেড়াতে পারেন না বুঝি ?

ভাগ্যিস।

তার মানে ?

এরকম না হলে বাঁচাতে পারতাম না। তারপর মায়া অন্য কথা পাড়ল। বলে, কি রকম করে এলে শঙ্কর-দা ? উড়ে এলে নাকি ?

দিব্যি টাঙায় চড়ে। সিংহিদের বাড়িতে না গেলে জানতে পারতে ; এক মাইল দূর থেকেও ঝঝ্ঝড় আওয়াজ পেতে।

মায়া বলে, তুমি আসছ--তোমার চিঠি পেয়েছি, বয়ে গেছে আমার সিংহিদের ওখানে যেতে। বাবাকে ঐ রকম বুঝিয়েছিলাম। সিংহিদের মেয়েটার সঙ্গে তাদের মোটর নিয়ে ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনে এই এতক্ষণ হা-পিত্তেশ বসে—

আমি যে কাশী স্টেশনে নেমে চলে এসেছি।

শেষকালে আমারও তাই মনে হল। তোমার কিন্তু খুব বুদ্ধি শঙ্কর-দা।

কেন ?

তোমায় সামাল করে দেব বলে ছুটোছুটি করে স্টেশনে গিয়েছিলাম। কি ভয় যে হয়েছিল তোমাদের মুখোমুখি দেখে, তুমি কিন্তু আন্দাজে বুঝে নিয়েছ।

মায়ার গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। বলতে লাগল, আমি একটা খবরের কাগজ বাড়িতে আনতে দিই নে শঙ্কর-দা,·· এই গয়না আর শাড়ির বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। হু-হু করে বুকের মধ্যে, তবু হাসিমুখে মিথ্যে কথা বলে যাই। বাবা চিরটা কাল কত নির্যাতন সয়েছেন জান তো ! যে গিয়েছে সে আর ফিরবে না। কিন্তু খবর শুনলে বাবা কাটা-কবুতরের মতো চোখের সামনে ছটফট করে মরে যাবেন।

রান্নাঘরে বসে চা খাচ্ছি, মায়া রুটি সেঁকছে। বলে, খবরদার শঙ্কর-দা, বাবা যেন ঘুণাক্ষরে কিছু না জানতে পারেন।

না, তা পারবেন না।

তুমি বেশিদিন থেকো না শঙ্কর-দা, কখন হয়তো কথায় কথায় বলে ফেলবে। দু-একদিনের মধ্যে চলে যাও—

যাব। কিন্তু চিঠি লিখে আনালেই বা কেন?

মায়া বলল, সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে চলো দাদা সারনাথে যাই। নূতন একটা মন্দির হয়েছে।

আমি বললাম, হাঁ, দেখবার জিনিস বটে! কিন্তু আজকে থাক, আজ বড় ক্লান্ত।

চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল জমেছিল, বাঁ-হাতে মুছে ফেলে মায়া বলল, দেখতে নয়, মন্দিরের চাতালটা বড় ঠাণ্ডা। ঐখানে বসে বসে তোমার কাছ থেকে সব শুনব। না কেঁদে কেঁদে আমি যে মরে যাচ্ছি দাদা। তোমায় এইজন্য চিঠি লিখে আনিয়েছি।

বিকাল বেলা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা রওনা হবার তোড়জোড় করছি, গোলমাল বাধালেন সোমনাথ। বললেন, ভাল হয়েছে। এই গাড়িতে আমি ঘুরে আসি। মন্দির তো উড়ে পালাচ্ছে না বউমা, আর একদিন যেও।

আপনি বেরুবেন?

সোমনাথ বললেন, এক বাঙালি প্রফেসার পাঁচটার সময় চায়ে ডেকেছে, আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনবে বলে। অনেকবার এসে ধরা-পাড়া করে গেছে।

মায়ার দিকে এক নজর চেয়ে আমি বললাম, তা হলে এই গাড়িতে আপনি চলে যান। আমরা রাস্তা থেকে আর একটা ডেকে নেব।

সোমনাথ হেসে বললেন, তবেই হয়েছে! যা চোরের উপদ্রব, বাড়ি দেখবে কে? আর তোমাকেও তো চাই শঙ্কর,—বুড়ো হয়েছি, নিজের উপর কি ভরসা আছে?

বোঝ ব্যাপারটা, সোমনাথের মুখে এই কথা! তাই তো কামনা করি, আর বুড়ো হবার আগেই যেন আমরা মরে যাই। মায়া বিশেষ আপত্তি করল না। বলে, তাই হোক শঙ্কর-দা। আমি থাকি বাড়িতে—

শহর ছাড়িয়ে ফাঁকায় এসে সোমনাথ আমার হাত ধরে নামালেন। বললেন, এবার বল্লো দিকি আমার খোকার কথা—

মুখ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

বললাম, পাঁচটা বাজে যে! প্রফেসার অপেক্ষা করছেন।

ও সব মিথ্যে কথা। খোকার খবর শুনব বলে এসেছি।

বুড়ার বিশীর্ণ গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। স্বদেশী-যুগের সর্ব-ত্যাগী নেতা তাঁর নাম সকলের মুখে মুখে ফেরে, তিনি করলেন কি—সেই ধূলিমলিন পথের ধারে আমগাছের শিকড়ের উপর বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। আর কেউ দেখে নি, দেখলাম কেবল আমি।

ফিরবার পথে তিনি বারম্বার সাবধান করে দিলেন, বড্ড চালাক মেয়ে আমার বৌমা। খবরদার! সে বেটি বুঝতে পারে নি তো কিছু?

ঘাড় নেড়ে জবাব দিই, না।

বাড়ি আসতে মায়া জিজ্ঞাসা করে, কি রকম মজলিস হল বাবা?

উৎফুল্ল কণ্ঠে সোমনাথ বলেন, আমি ভেবেছিলাম, এমনি দু-চার জন। মস্ত বড় ব্যাপার—ঘরে ভরে গিয়েছিল।···তোমার একা একা খুব কষ্ট হয়েছে—না মা?

মায়া হেসে বলে, একা থাকতে আমার বয়ে গেছে। সিংহি-বাড়ির মেয়েরা এসেছিল—খুব তাস আর কড়াইভাজা চলল। এই একটু আগে তারা চলে গেছে।

বারান্দায় নিয়ে এসে আমায় চুপি-চুপি বলে, অভিনয়ের এই খোলসগুলো ছেড়ে একটুখানি বেঁচেছিলাম, দাদা। কিন্তু যে রকম গল্প করা বাতিক তোমার—কিছু বলে ফেল নি তো?

জবাব দিই, না—কিচ্ছু না।

সেই রাত্রেই কাশী ছেড়ে এলাম।

## কুন্তল-দার মৃত্যু

বরানগরের ছাতটিতে যথারীতি আমরা গিয়ে জুটেছিলাম। আস্তিন গুটিয়ে মাদুরের উপর সশব্দে এক কিল মেরে কুন্তল-দা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিলেন, আর তিন বৎসরে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

এক কোণে মা হাসিমুখে চেয়েছিলেন; কুন্তল-দার মা, আমাদের সকলের মা। মায়ের কোলের কাছটিতে সুরমা। হঠাৎ সুরমা সোজা হয়ে বসে এসরাজে ঝনাঝন আঙুল চালাতে শুরু করে। কুন্তল-দা তাড়া দিয়ে ওঠেন, থামো -

মা বললেন, তার চেয়ে তোরাই চেঁচামেচি থামা। আমার মায়ের হাতের বাজনা শুনেছিস কোনদিন?

এটা কি বাজনার সময়?

মা বললেন, কেন নয় শুনি।

কুন্তল-দা বলেন, ঘরে আগুন লেগেছে, সব জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে—

সুরমা খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলে, ঘরে নয়—গোয়ালে। আওয়াজ আমাদের উপরতলা অবধি গেছে।

হিরণ হাত-মুখ নেড়ে আপত্তি জানাল। বলে, গোয়াল মানে? আমরা তবে কি···শোন কুন্তল, উনি আমাদের গরু বলছেন।

সুরমা বলল, সত্যি সত্যি আমার বুকের মধ্যে কাঁপছিল। না জানি, কি ভয়ানক ব্যাপার! একদম ছুটে এসেছি।

অর্থাৎ তুমি একটি ভয়ানক মিথ্যুক। ছুটে এসেছ, এসরাজ হাতে নিয়ে তো?

সুরমা তর্কে হারবার মেয়ে নয়।

এই এসরাজই খাড়া করলে লাঠি হতে পারে।

ব্যঙ্গের সুরে কুন্তল-দা বলেন, তা ঠিক। কিন্তু করবে কে? তোমরা?

রাগে মুখ লাল করে সুরমা বলে, পারি কিনা পরখ করে দেখেছেন?

করছি, কাছে এসো।

তারপর বলা নেই কওয়া নেই, একটা আলপিন তুলে নিয়ে কুন্তল-দা তার সুন্দর শুভ্র আঙুলে ফুটিয়ে দিলেন। মা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, করিস কি, ওরে ডাকাত ছেলে? দেখ দিকি কাণ্ডটা—

কুন্তল-দা বললেন, সামান্য একটা আলপিন, মা। বোমা নয়, মেশিনগান নয়···ইঃ, রক্ত বেরিয়ে গেল দেখছি!

কোথায় রক্ত? সুরমার বিরক্ত মুখ এতক্ষণে স্বচ্ছ হাসিতে ভরে গেছে। কুন্তল-দার এরকম পাগলামি আমরা আগেও দেখেছি। এমন গম্ভীর মানুষ, কিন্তু মাঝে মাঝে একটি শিশু যেন তাঁর মধ্যে খেলা করে বেড়ায়। সুরমা বলে, রক্ত কোথায় মাগো? রক্ত নয়, মধু।

আচ্ছা, দাও তো মধুর ফোঁটা কপালে পরিয়ে।

মা রাগ করে ওঠেন, বাহাদুরি কত। তিলক পরে সব জয়যাত্রায় বেরুবি নাকি?

সুরমার টিপ্পনীও সঙ্গে সঙ্গে। গোছাখানেক চুল কেটে দিতে হবে না কুন্তল-দা, মহাবীরদের ধনুকের ছিলা হবে ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এ চলবে না কুন্তল-দা। যাই বলুন, আপনার এই তিলক-টিলক একেবারে সেকেলে।

এতে আমাদের তো কিছু নয় শঙ্কর, এ কেবল ওরই জন্যে। কুন্তল-দার স্বর গম্ভীর হয়ে উঠে। বলেন, ফোঁটা পরে কেউ বাঘ-সিংহ হয় না—সে তোমরা জানো, সবাই জানে। কিন্তু যে-হাতে স্বরমা ফোঁটা পরিয়ে দেবে, সে-হাতে এসরাজ ধরতে ওর লজ্জা করবে।

সুরমা জ্বলে উঠল। গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদ কিছু থাকবে না, দেশের মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, এই আপনাদের সাধনা ? দেশটাকে মরুভূমি বানাতে চান ?

কুন্তল-দা বলেন, না, আমরা চাই ঐশ্বর্যবান দেশ। সকলে ভাল খাবে, ভাল পরবে। আর তার জন্য পরকাল অবধি অপেক্ষা করতেও বলি নে, মোটে এই তিনটে বছর। আমরা যা বলি, সেই মতো কাজ করো তো সকলে—

সন্ধ্যার পর সুরমা আবার এসেছে। ঘরে একলা কুন্তল-দা। এ সব পরে সুরমার মুখে শুনেছি; তার মুখে শোনা কাহিনী আমি নিজের মতো করে বলে যাচ্ছি। শেষের মাসখানেক ছাড়া মাঝের ব্যাপারে আমার কোন যোগাযোগ নেই।

মেঝের উপর ছড়ানো ছিল কুন্তল-দার কাপড়-জামা, টুকিটাকি জিনিসপত্রের আণ্ডিল। একটা টিনের বাক্সে তিনি সমস্তগুলো ভর্তি করবার চেষ্টায় ছিলেন। সুরমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ?

এসরাজ ফেলে গিয়েছি—

ওঃ !—বলে কুন্তল-দা আবার নিজের কাজে লেগে গেলেন।

সুরমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক দেখে। শেষে বলল, সূচের ছেঁদায় হাতী ঢুকবে না, গায়ের জোর যতই থাক। সরুন।

কুন্তল-দা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। আবার সাবধান করে দেন, সমস্ত দরকারি ; কিছু যেন বাদ পড়ে না—

সমস্ত ? এটা ? এটাও ? স্তূপের ভিতর থেকে বেরুতে লাগল ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথা-ভাঙা ফাউণ্টেনপেন, মায় একটা পাখার বাঁট পর্যন্ত।

এসব এর মধ্যে এল কি করে ?

এমনি এসে জোটে। সংসারের সব অকেজো কি বাদ দিয়ে চলা যায় ? একটুখানি স্তব্ধ হয়ে সুরমা কুন্তল-দার জবাবের প্রত্যাশা করল। তারপর মুখ তুলে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু আপনি পারেন। আপনার পথে আপনার সঙ্গে ছুটতে গিয়ে যারা পেরে উঠল না, ধুলোর মধ্যে তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলতে আপনার এতটুকুও বাধে না। আপনি তো মানুষ নন।

কুন্তল-দা বলেন, আমি জানোয়ার ?

না, পাথর।

তারপর সুরমা প্রশ্ন করে, ভোরে চলে যাচ্ছেন ?

হাঁ।

কোথায় ?

কুন্তল-দা উত্তর দেন না।

সুরমা অধীর ভাবে বলতে লাগল, তার মানে—বলবেন না, আমায় বিশ্বাস করে তা বলতে পারেন না। বেশ। ফিরবেন কত দিনে, সেটা বলতে আপত্তি আছে ?

সুরমার উত্তেজনায় কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। বলেন, আমি তা জানি নাকি ?

আপনি কিছু জানেন না। একটা কথাই কেবল চূড়ান্ত করে জেনে রেখেছেন, তিন বছরে দেশ স্বাধীন হবে। আপনার হিসাবে ভুল হয় না।

মাইনে দিয়ে কলেজে পড়েছি, ভুল হলেই হল ? অকস্মাৎ কুন্তল-দার কণ্ঠ অতি মধুর ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। বলেন, কেন আমাদের কথা এত ভাবো সুরমা ? ক'টিই বা ছেলে, হয়তো বা কয়েক হাজার—

সুরমা বলে, কেন ভাবব না ? এই তো, এই মাটিরই মানুষ,—অথচ দেশের পরে এমন ভালবাসা কোথা থেকে আসে ? কোথায় পায় এমন মনের জোর ? এদের এক একজন যে এক একটা জাতের নূতন ইতিহাস গড়ে তুলতে পারে ! একটু চুপ করে থেকে নিশ্বাস ফেলে আবার বলে, অথচ ক'জনই বা এদের জানে !

কুন্তল-দা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, না-ই বা জানল। কিন্তু এদের অত ভালবাসা আজকে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। বোন, মনের চেহারা যে দেখা যায় না—তা হলে দেখতে, শান্ত সুস্থ একটা লোক আজ এত বড় দেশের মধ্যে নেই।

কেউ নেই ?

না। নূতন সূর্য উঠেছে, মানুষ চোখ বুজে থাকতে পারে কতক্ষণ ?

দু'জনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সুরমা সহসা আনত হয়ে কুন্তল-দার পায়ে প্রণাম করতে যায়। কুন্তল-দা সভয়ে পিছিয়ে গেলেন।

এই দেখ মুশকিল। পাথর বলে গালি দিলে, এবার পাথরের দেবতা বানাতে চাও বুঝি ! না—না—না—

তারপর কত দিন গেল, কুন্তল-দার উদ্দেশ নাই। ইতিমধ্যে সুরমা

দু-দুটো পাস করেছে, একটায় স্কলারশিপও পেয়েছে। বাগবাজারের দিকে এখন নূতন বাড়ি হয়েছে, তারা সেখানে থাকে। মায়ের সঙ্গে তাই ইদানীং বড় একটা দেখা হয় না, তিনি সেই বালি-খসা পুরানো বাড়িটাতেই থাকেন। ছেলে নেই, কিন্তু মুখে সেই রকম হাসিটি আছে। পরের ছেলে আমরা অনেকে গিয়ে মায়ের ভালবাসা ভাগ করে নিই।

এরই মধ্যে একবার সুরমার মাসিমারা বড় মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় এলেন। মেসোমহাশয় সাব-রেজিষ্ট্রার, কিছুকাল আগে ঢাকার দিকে এক গাঁয়ে বদলি হয়েছেন। এদের পাড়াতেই বাসা তাঁদের।

সকালবেলা সুরমা এবং মাসিমার মেজ মেয়ে আভা এক সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছে; জুতোর ভয়ানক রকম আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে দেখে, এক গোরাসৈন্য ঘরে ঢুকেছে। দালানটা আগাগোড়া মার্চ করে এসে সে এক লম্বা মিলিটারি সেলাম দিল।

আভা চেয়ে দেখে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলে, রাঙাদি ভাই, ভয় পেয়েছিস? বাঘ নয়—বাঘের মাসি, মিউ-মিউ করে। আমাদের বিনয়-দা।

ছেলেটির কথা ইতিপূর্বেও হয়েছে তাদের মধ্যে। সে হস্টেলে থাকে, এবার এম-এ দেবে, আভাদের পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আভার মাকে মা বলে ডাকে।

বিনয় অপ্রতিভ হয়ে গেছে। সে ভুল করেছিল; ভেবেছিল, আভা আর তার দিদি হাসি। একটা-কিছু বলে সে পালাবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু আভা ছাড়ে না।

সেলাম দিলে বিনয়-দা, তা সাহেব যে মুখ ফিরিয়ে রইল!

বিনয় বলে, কোথায় সাহেব?

মোটে দেখতেই পাও নি?

সুরমার মুখ লাল হল। এই রকমের একটা শলা-পরামর্শ চলছে, সে আন্দাজে বুঝতে পেরেছে। সুরমার বাপ ছেলেটিকে বড্ড পছন্দ করেছেন। কিন্তু এখন এই বিনয়ের সামনে আভাটার কিছু করবার জো নেই কিনা, সে তাই খুব মজা পেয়ে গেছে। বলে, দেখ তো চারদিক খুঁজে, শাড়ি-টাড়ি জড়িয়ে সাহেব ছদ্মবেশে আছেন কিনা।

বিনয় বলল, সাহেব-টাহেব মানি নে। আমি কারো গোলাম নই।

আভা বলে, এখন না থাকো, বাঙালির ছেলে যখন,—হতে তো হবেই। খামোকো মনিব চটিয়ে রেখো না। আর সে তুমি নিজেই বেশ জান। নইলে সেলামের রিহার্সাল দিয়ে রাখছ কার জন্যে শুনি?

বিনয় চটে যায়। বলে, কাঁচ আর হীরের তফাত বুঝতে বুদ্ধি লাগে, বুঝলে? ওকে সাহেব-সেলাম বলে না—আমাদের রেজিমেন্টে সব চেয়ে নমস্য কেউ এলে—

হাসির চোটে আভা কথা শেষ করতে দিল না। বলে, ঠিক, ঠিক—এ রকম নমস্য আর কে তোমার কাছে? কিন্তু এই যাত্রা-দলের পোশাকটা খুলে ফেলে এবার ভদ্রলোক হয়ে এসো দিকি।

বিনয় বলে, য়্যুনিভার্সিটি ট্রেনিং-কোরের পোশাক—যাত্রার পোশাক বললে প্যাঁচে পড়বে, জেল হয়ে যেতে পারে। ভোরবেলা ময়দানে যেতে হয়েছিল, এই ফিরছি। রীতিমত প্যারেড হল—

আভা বলে, বাঁশের বন্দুক নিয়ে?

বিনয় রাগ করে বেরিয়ে গেল।

আভার হাসি আরও উচ্ছ্বসিত হয়। বলে, কেমন মানুষ বল্ রাঙা-দি? একটুতে রেগে যায়—রাগাতে মজা খুব। কিন্তু বুদ্ধি আছে—

এরই পাশাপাশি আজ কুন্তল-দাকে মনে পড়ে। কত ধৈর্য, কত সাহস—কিন্তু রাগাতে একটা মিনিটও লাগে না, তখন মনে হয়

'একেবারে ছেলেমানুষটি। হেমন্তের এই স্নিগ্ধ সকালবেলায় হয়তো কোন দূর-দুর্গম গ্রামপ্রান্তে—কোন জলায় জঙ্গলে পাহাড়ের ধারে এখন তাঁরা কি করছেন—কি ভাবছেন? কবে উঠবে আকাশে তাঁদের অনেক প্রতীক্ষার নূতন সূর্য, ঘরের ছেলে সব ঘরে আসবে!

আভারা রইল প্রায় মাস তিনেক। যাবার ক'দিন আগে থেকে সে সুরমাকে বড় ধরে বসল, চল্ না ভাই-রাঙাদি, দিন কতক থেকে আসবি। বড়-দিদি বরের সঙ্গে ছুটল, কার সঙ্গে যে ঝগড়া করব!

আবার তাদের সেই জায়গাটারও অতি চমকপ্রদ বর্ণনা দিতে শুরু করল'। ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়েছে প্রকাণ্ড এক খাল। তারই কিনারে ওদের বাসা। জোয়ারের সময় জানালার নীচে জল ছল-ছল করে। ছাত থেকে দেখা যায়, অনেক দূরের কালো মেঘনা—নৌকা দেখা যায় না, যেন সারবন্দি হাজার হাজার পাল মেঘনার উপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলেছে।

এমনি আরও কত কি! সুরমা চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু বাবার মত পাওয়া যায় না। মা-হারা মেয়েকে তিনি কাছ ছাড়া হতে দেন না।

কিন্তু বছর দেড়েক পরে সেই বাবাই অভাবিত রূপ সদয় হয়ে উঠলেন। বললেন, চল্—হরিলাল বার বার লিখছেন যখন ঘুরেই আসা যাক একবার। আর ঐ রকম খোলা-হাওয়ায় আমার শরীরের উপকার হবে।

সুরমা বলে, শরীরের ভাবনায় তো তোমার ঘুম নেই, বাবা। আসল কথাটা কি? আপদ-বিদায়ের আবার নতুন ষড়যন্ত্র হচ্ছে বুঝি?

বাবা বললেন, তা-ই যদি হয় সে-ও তো শরীরের জন্য? বয়স কম হল না, যদি হঠাৎ আজকে চোখ বুজি—

বুঝেছি। আমি তোমার ভার-বোঝা, কাঁধ থেকে না নামিয়ে শান্তি নেই। যেখানে হোক—

বাবা রীতিমত চটে ওঠেন, যেখানে হোক মানে? বিনয় কি যে-সে ছেলে? হাজারে অমন একটা মেলে না। হরিলাল লিখেছেন, তার বাপ-মাও ওখানে রয়েছে। যোগযোগটা দেখ একবার।

তার পর পাশে বসিয়ে ছোট-খুকিটির মতো সুরমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। বললেন, বুঝে দেখ মা, আমার মনেও তো সাধ-বাসনা আছে! তোর মা চলে গেলেন···বাড়ি সেই থেকে অন্ধকার। চুনের কলি ফেরাই নি, দরকারের বেশী একটা আলো জ্বালাই নি কোনদিন। তুই-ই বল্ তো, মানুষ এ রকম করে থাকতে পারে?

সুরমার বড় ব্যথার জায়গাটিতে আঘাত পড়ল। বাপের খুশি-ভরা মুখ দেখবার জন্য সে পারে না, এমন কাজ নেই।

ঢাকা থেকে মোটরলঞ্চে ওরা গিয়ে পৌছল। প্রকাণ্ড এক বট-গাছের নিচে ঘাট। লঞ্চের আওয়াজ পেয়ে সবাই ছুটেছে, আভাও এসেছে--সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সুরমা কাছে গিয়ে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। বাসা ঠিক খালের উপর না হলেও কাছাকাছি বটে! এদিকে সেদিকে সেকালের ভাঙ্গাচোরা অট্টালিকা—পাতলা ইটের টুকরা স্তূপাকার হয়ে আছে।

আভার কানে কানে সুরমা বলে, তোদের সোনারগাঁয়ে সোনা নেই—কেবল ঢিল পাটকেল।

আভা বলে, সোনা কি রাস্তায় ফেলে রাখবার জিনিস? অনেক দূরে সাদা রঙের একতলা খানকয়েক বাড়ি, সেই দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, সোনা ঐখানে মজুত আছে রাঙা দি—

ঐটে বাসা ওদের ?

ওটা হল থানা ; পিছনে কোয়ার্টার। সোনা পুলিসের হেপাজতে আছে—নিশ্চিন্তে থাকবি ভাই।

তোর বিনয়-দা পুলিস হয়েছেন ? স্বরমা একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

আভা বলে, নূতন বলেই গাঁয়ে আসতে হয়েছে। বাবা বলছিলেন, ওঁর যা বিদ্যে-বুদ্ধি—একটু পাকা হলে সদরের মাথা হয়ে উঠবেন। ভাবনার কিছু থাকবে না।

ম্লান হেসে স্বরমা বলে, যা ভেবেছিস আভা! দেশের এ কি হয়েছে আজকাল, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাবনা আর কিছুতে ঘোচে না। ছেলে নিয়ে বাপের দুশ্চিন্তা, স্ত্রী নিয়ে স্বামীর দুশ্চিন্তা—কে কখন কি করে বসে। তবে হাঁ—পুলিস হলে নিশ্চিন্ত। সেগুনকাঠে ঘুন ধরার জো নেই।

বিকালে এরা খালের ধারে বেড়াত। বেড়াবার মতোই জায়গা। পাকা রাস্তা খালের ধারে ধারে চলে গিয়েছে সেই মেঘনা অবধি। বর্ষার খরস্রোত সুতীব্র আবেগে ব্রহ্মপুত্রের দিকে একটানা চলেছে—কিনারের শরবন থর-থর করে কাঁপে। ওপারে দিগন্ত-বিসারী ধান আর পাটক্ষেত। যতদূর নজর চলে – সতেজ সবুজ শ্রী।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে তারা অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ভয়ের অবশ্য কারণ নেই, সঙ্গে রামচরণ আছে—পুরানো চাকর, গায়ে বল-শক্তিও খুব। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখে, তেঁতুল-তলার জঙ্গলের ধারে বিনয় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে—

আভা আশ্চর্য হয়ে বলে, এখানে ?

কপালে হাত দিয়ে বিনয় বলে, অদৃষ্ট! কি করব বলো—খোঁজে খোঁজে আসতে হয়।

সুরমা বলে, কিন্তু মন বলে যে বস্তুটা আছে বিনয়বাবু, তাকে তেড়ে ধরতে গেলে বিগড়ে পালায়।

বিনয় জিভ কাটল। সর্বনাশ! আপনার পিছু নিয়েছি, তাই ভাবছেন? তা হলে এটির কি দরকার ছিল বলুন তো?

কাপড়ের নিচে কোমরে রিভলভার বাঁধা ছিল, সন্তর্পণে খুলে দেখাল। তারপর দুঃখিত স্বরে বলতে লাগল, পুলিসে কাজ নিয়েছি, তাই বোধ হয় এবার এসে অবধি মন ভারি করে আছেন। পুলিস না হয়ে পাটের মহাজন হলে খুব খুশি হতেন। তবুও আমরা দোষীর সাজা দিই, তাদের মতো নিরীহ নির্দোষ চাষীদের রক্ত শুষে মারি নে—

সুরমা হেসে বলে, না—পাটের মহাজনের উপরও আমার অচলা ভক্তি নেই। কিন্তু এখানে, কাউকে তাড়া করে ফিরছেন?

একটু ইতস্তত করে বিনয় বলে, এক-আধটি নয়, আস্ত একটা দল। আর তারা চোর-ছ্যাঁচোড়ও নয়—

স্বদেশী ডাকাত?

বিনয় বলে, ডাকাতির কোন খবর পাওয়া যায় নি, মিথ্যে বদনাম দেবো কেন? তবে স্বদেশী বটে—জ্বলন্ত আগুন।

আগ্রহের সুরে সুরমা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা—ধরা পড়লে তাদের কি ফাঁসি হবে?

বিনয় বলে, আপনি কি ভাবেন বলুন তো? ফাঁসি কি এত সোজা? কোন চার্জ নেই তাদের বিরুদ্ধে।

তবে?

ঐ যে বললাম, ও আগুন, কখন খাণ্ডব-দাহন হয়, উপরওয়ালার হুকুমে তাই চোখে চোখে রাখবার নিয়ম!

এরই দিন পাঁচ-সাত পরে একেবারে এক অসম্ভব কাণ্ড। বিনয়ের

মা ভাবী পুত্রবধূকে ভাল করে দেখবেন বুঝি, আভা আর সুরমাকে বাসায় নিমন্ত্রণ করেছেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে খানিকটা রাত হল। এরা সব ফিরে আসছে। আঁধারের মধ্যে কে-একজন জিজ্ঞাসা করল, থানাটা কোন্ দিকে ?

রামচরণ সকলের আগে। নিরুৎসুক কণ্ঠে সে জবাব দিল, ডান-হাতি চলে যাও বাপু।

আকাশ-ভরা মেঘ, গাঢ় আঁধার। লোকটা হঠাৎ কাশতে শুরু করল। সে কি কাশি, যেন হাপরের আওয়াজ হচ্ছে, পাঁজরার হাড়গুলো এইবার বাঁধন খুলে ছড়িয়ে পড়বে। সুরমার হাতে টর্চ, এক-একবার টিপে পথ দেখে নিচ্ছিল—আলো সে লোকটার মুখের উপর ফেলল। এক মুহূর্ত, তারপর আর একবার। বিদ্যুতাহতের মতো সে চমকে দাঁড়াল। আবার সে আলো ফেলল সেদিকে—

আভা বলে, দাঁড়ালি কেন রাঙা-দি ?

লোকটির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সুরমা ডাকল, আমাদের সঙ্গে আসুন – আমরা পৌঁছে দেবো—

উৎকট কাশির ফাঁকে কোন রকমে লোকটি বলে, আপনারা তো বাঁয়ে ফিরছেন—

দরকার হলে ডাইনেও যাওয়া যাবে। কিন্তু এই ঘুরকুট্টি আঁধারে আপনি সমস্ত রাত ডাইনে ছুটোছুটি করলেও থানায় পৌঁছবেন, মনে করেন ?

সুরমার ব্যগ্রতায় অবাক হয়ে আভা এসে তার হাত ধরল। সুরমা ফিসফিস করে বলে, কুন্তল-দা—

তাদের মধ্যে অনেক গল্প হয়েছে কুন্তল-দার সম্বন্ধে। কুন্তল-দার সঙ্গে চেনা-পরিচয় আছে—সমবয়সির মধ্যে এ একটা কতবড় গর্ব! আভা

পেছনে তাকায়। অতি মন্থর পায়ে ছায়ামূর্তিটি আসছে। হঠাৎ কুন্তল-দা বলে ওঠেন, যাচ্ছি বটে, আমার কিন্তু বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—

সুরমা বলে, থানায় পোলাও-কালিয়া সাজিয়ে নিয়ে আছে বুঝি?

কুন্তল-দা জবাব দেন, তা বলে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করবে না, তা-ও জেনে রাখবেন।

বাড়ি এসে দেখে সবাই নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। এই রাতে এক পথের আপদ জুটিয়ে আনায় রামচরণ খুব বিরক্ত হয়েছে, তিক্ত কণ্ঠে বলল, যাও ঠাকরুনরা, ঘরে গিয়ে দুয়োর দাওগে। লাটসাহেবকে থানায় তুলে দিয়ে আসি।

আভা বলে, না—বৈঠকখানার পাশের ঘরটা খুলে দে। আর পা ধোবার জল নিয়ে আয়।

কুন্তল-দা সুরমাকে চেনেন নি। অন্ধকার রাত্রিবেলা, অনেকদিন দেখা নেই। তা ছাড়া ও-মানুষটির কাছে তুমি আমি সকলে একেবারে স্রোতের শেওলার মতো, যতক্ষণ সামনে আছি দেখছেন, আড়াল হলে আর কেউ নই।

আশ্চর্য হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কার বাড়ি এটা? আপনাদের মতলব কি, এখানে আটকে রাখতে চান নাকি?

সুরমা বলে, রাত্তিরটা তো বটে! ক্ষিধে পেয়েছে, তা কিছু খেয়ে জিরোতে জিরোতেই তো সকাল হবে। অত ভয় কিসের? কি এমন সোনা-রূপো গায়ে পরে আছেন—

আভার কানে কানে বলে, গায়ে নয়—মনের মধ্যে ওঁর কত সোনা—সোনার পাহাড় রে আভা! পথের ধুলোয় সত্যি সত্যি সোনা কুড়িয়ে পেলাম।

দু'বোনে ছুটোছুটি করে খাবার যোগাড়ে গেল। কি আর থাকবে এমন সময়—খই আর একটুখানি দুধ। কাঁধের উপর একখানা কোঁচানো ধুতি এবং দু-হাতে দুটো বাটি নিয়ে আভা বলে, রাঙা-দি, তুই ভাই জলের গেলাসটা নিয়ে আয়। দেরি করিস নে···

সুরমার তবু একটু দেরি হল। চোখ-মুখ মুছে শান্ত হয়ে সে ঘরে ঢুকল। বলে, খাওয়া হল, এবার শুয়ে পড়ুন—বিছানা হয়ে গেছে। তারপর তার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমায় কি একেবারে চিনতে পারলেন না, কুন্তল-দা ?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একটুখানি চেয়ে কুন্তল-দার মুখে হাসি ফুটল। সুরমা বলতে লাগল, ঐ গোঁফ-দাড়ি আর উস্কো-খুস্কো পাগলের মতো চেহারা—আমি তবু এক নজরে চিনেছি।

কুন্তল-দা বললেন, গলা শুনে আমারও চেনা-চেনা লাগছিল হে! তখন তোমার হাতে আলো, আমার চোখে অন্ধকার। তা ছাড়া এই রকম জায়গায়, এই অবস্থায়···কথাটা বোঝ একবার—চলে এসেছি, সে-ও তো কম দিন হল না।

কতদিন ? বলুন তো হিসেব করে। এত দুঃখের মধ্যেও সুরমার কণ্ঠে কৌতুকের রেশ বেজে ওঠে। বলে, আপনার তিন বছরের আর কত বাকি কুন্তল-দা ?

কুন্তল-দা খাড়া হয়ে বসলেন, বিশীর্ণ মুখের উপরে কোটরগত চক্ষু-দু'টি জলজল করে ওঠে। বলেন, তিন না হয় তিরিশ হবে। তাতে কি আসে যায় ? আমি মিথ্যে বলছি মনে কর ? ঘর-বাড়ি আপন-জন ছেড়ে মিথ্যার পিছনে পথে পথে ঘুরছি, আমি বোকা ?

সুরমা তাঁর পাশে গিয়ে পিঠের নিচে বালিশ গুঁজে দিল। কপালে মাথায় অতি ধীরে ধীরে সে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, ঘাট মানছি

দাদা, আপনার বুদ্ধির জোড়া নেই। এবার লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে পড়ুন দিকি।

আভা বলে, কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করে জেলে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার চেষ্টায় ইস্তফা তা হলে?

আমি যাচ্ছি, সবাই যাবে না। জেলে ক'টা লোক ধরে? জেলের পাঁচিলে কি মত আটকায়—কোন দেশে কেউ পেরেছে?

আভা তর্ক করে, সত্যি সত্যি যদি এত ভরসা, তবে আপনিই বা যেতে চান কেন শুনি?

ইচ্ছে করে বুঝি! কুন্তল-দার কণ্ঠে অভিমানের স্বর ধ্বনিত হল। বললেন, এতদিন এত কষ্টের পর একটু বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি, অমনি তোমরা নানা কথা বলবে। দেখ তো, এ শরীরে কি কাজ করা যায়?

রাগ করে গায়ের ময়লা শতচ্ছিন্ন জামাটি খুলে ফেললেন। শীর্ণ দেহ বললে কিছুই বলা হয় না, বীভৎস চেহারা। করুণাকে ছাপিয়ে ঘৃণাই যেন মনের মধ্যে মাথা তুলতে চায়। কুন্তল-দা বলেন, দেখ তো চেয়ে, টর্চ আছে—ফেলে দেখ। আমি ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ছি?

আভা তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল। বলে, দাদা, আপনি আমায় চেনেন না। কিন্তু আমি জানি, ফাঁকি আপনি দিতে পারেন না, আপনার মধ্যে একতিল ফাঁকি নেই। আপনি কত বড়—

এ কথায় কুন্তল-দার রাগ থাকে না, হেসে ফেলে বললেন, তা বুঝেছি। এরই মধ্যে ও-সমস্ত হয়ে গেছে? সুরমাকে দেখিয়ে বলেন, ওর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না ভাই, আমার বড্ড বদনাম রটায়, আমাদের কথা রাতদিন ভাবে।

সুরমা বলে, আপনারা যে ভোলবার নন, ভুলি কেমন করে? না

ভেবে উপায় কি বলুন? আপনার হয়তো মনে নেই দাদা, আপনি বলেছিলেন, এখানে এই মাটির ধূলোয় ছোট-বড় সকলের মধ্যে সুখের বন্যা আসবে, কারও আর দুঃখ থাকবে না। ঘরের ছেলে সব আবার ঘরে আসবে। আমি যে প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে দিন গুণছি।

আবেগে তার কণ্ঠ বুজে আসে। কুন্তল-দা স্তব্ধ নির্ণিমেষ চোখে চেয়ে থাকেন। তারপর গভীর কণ্ঠে বলেন, সেদিন আসবেই বোন, তার কোন ভুল নেই। একটু হয়তো দেরি হয়ে গেল। আমি দেখব না—কিন্তু তোমরা দেখবে। এই কথাটা নিশ্চিত জেনে রেখো, তোমার এই দাদারাই দেশের মধ্যে শেষ দুঃখীর দল

রবিবার। সকালবেলা—খুব সকালে সুরমার বাপ আর মেসো বেড়াতে বেরিয়েছেন। ছুটির দিনে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়া হয়, কর্তা নিজে কেনাকাটা করেন, জেলেপাড়া ঘুরে সমস্ত সওদা করে বাড়ি ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে।

দুই বোন ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে দেখে, কুন্তল-দা হাত-পা ধুয়ে বারান্দায় এসে বসেছেন। বললেন, খানিকটা চুন আনতে পার ভাই, গা-গতর আর আস্ত নেই, খুঁচে খেয়েছে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুরমা প্রশ্ন করে, কে?

আমারই প্রজাবর্গ, যাদের অধিকারে ভাগ বসিয়েছিলাম। এই আমরা যেমন খোঁচাখুঁচি করি সরকার বাহাদুরকে, সেই রকম আর কি! বলে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। বলতে লাগলেন, ঐ সব পাটের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছ, ওরই মধ্যে রাজাসন পড়েছিল—একেবারে মেঘনা অবধি একেশ্বর রাজ্য। দিনে বিশ-পঁচিশটা জোঁক ছাড়াতে হত, এ ছাড়া আর কোন অসুবিধা ছিল না। তোফা ছিলাম,

কিন্তু অদৃষ্ট দেখ—আকাশের দেবতা বাদী হয়ে কিছুতেই টিঁকতে দিল না।

কুন্তল-দার ভঙ্গি দেখে এরাও হেসে ফেলে। সেই পাটের ক্ষেতের গল্প শুরু হল। দু'টি বিমুগ্ধ শ্রোতার সামনে কতকাল পরে তিনি প্রাণ খুলে গল্প করছেন, এ যেন আয়ুর উপান্তে-এসে-পড়া অবসাদগ্রস্ত রোগশীর্ণ আমাদের কুন্তল-দা নন, আর কেউ···

খালের ওপারে ঐ পাটক্ষেতে যতদূর তাকাও, ক্ষেতের পর ক্ষেত চলেছে। সতেজ পাটচারা, জায়গায় জায়গায় একটা কেন দুটো-আড়াইটে মানুষকেও ছাড়িয়ে যায়। তারই মধ্যে যেখানে খুশি ঢুকে পড়ে, খানিকটা পাট ভেঙে শুয়ে বসে দিব্যি সারাটা দিন কাটিয়ে দাও। তার পরে রাত হলে, চুপি-চুপি বেরিয়ে পড়ো—খালে জল রয়েছে, স্বচ্ছন্দে স্নান করতে পার। তালতলায় এ সময়টা দু-একটা পাকা তাল পাওয়া যায়, কপালে থাকলে গ্রামের মধ্যে কারও হেঁসেলে উৎকৃষ্টতর জিনিষও কিছু মিলতে পারে। এর উপর কুন্তল-দার আবার বাবুয়ানা আছে, রাতে রাতে নারিকেল-পাতা কুড়িয়ে দিব্যি এক গদি তৈরী করে ফেলেছেন। ছিল তো চমৎকার, কিন্তু শেষাশেষি বর্ষা বড্ড চেপে পড়ল, নারিকেল-পাতা পচে ডাঁটাগুলি কেবল রইল, ক্ষেতের উপর একহাত জল। জ্বর মাস ছয়েক ধরেই চলছিল, শেষে মোটে ছাড়ে না, কাসতে গেলে দলা-দলা রক্ত বেরোয়। এই সব নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে তবেই না তিনি থানায় চেপে পড়বার ফিকির বের করেছেন!

কথার মাঝখানে সগর্বে কুন্তল-দা জিজ্ঞাসা করলেন, আনারস খেয়ে থাকো তোমরা? বুকে থাবা মেরে বলেন, আমি—আমি খাই—

আভা বলে, এটা তো আনারসের সময় নয়! কলকাতায় মেলে, তা বলে এখানে কি—

হ্যাঁ, এখানেও। বদরগঞ্জের হাট তো শনিবারে, গেল শনির আগের শনিতে আনারস খেয়েছি। একটা নয়, একজোড়া—এখনও ঢেকুর উঠছে।

স্থরমা বলে, আনারসের লোভে হাটে ঢুকে পড়েছিলেন নাকি?

না হে, লোকে এসে ভেট দিয়ে গেল। কিন্তু হাটে ঢোকাই ভাল ছিল দেখছি। আদর করে চাই কি গাড়ি-পাল্কিতে তুলে আমায় থানায় পৌঁছে দিত; তোমাদের খোসামোদ করতে হত না। তার পর ব্যস্ত হয়ে বলেন, সত্যি তোমরা উদ্যোগ করছ না, এ ভাল কথা নয়। আমাকে রাখার বিপদ আছে, জানো?

স্থরমা বলে, রামোঃ, সে বুঝি জানি নে? থানা এই এক্ষুণি এখানে এসে হাজির হবে, দেখবেন। কুন্তল-দার কপালে হাত রেখে বলে, এইবার কিন্তু জ্বরটা একেবারে ছেড়ে গেছে।

কুন্তল-দা বলেন, কিন্তু মায়া ছাড়তে পারবে না, আবার আসবে। সত্যি স্থরমা, আজ কি ভাল লাগছে, কি বলব! তা বলে মরাটাকে আর কেয়ার করি নে। লোকে তো মরে ভূত হয়, আমি জ্যান্ত থাকতেই খুব প্রাকটিস করে নিয়েছি। মরে গেলে কোন রকম অস্থবিধা হবে না। তোমাদের চলাফেরা দিনের বেলা, আমি বেড়াতাম রাতের অন্ধকারে। বলো, ভূতের সগোত্র হলাম কিনা? আনারস দিয়েছিল তারা ভূতকে, মানুষ চাইলে মানুষে কি সহজে দেয়।

আনারসের কথা বলতে গিয়ে কুন্তল-দা হেসে খুন। কি অন্ধকার তখন! কৃষ্ণপক্ষের রাত, এমনি দিনেই তো মজা। কুন্তল-দা পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর ধীর পায়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন··· তার পর শ্মশান-ঘাটের কাছে এলেন। রাস্তায় খানিকটা দূরে চরের

কিনারায় শ্মশান। একটা মড়া পুড়ছে, দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাস্তার পাশে উল্টে-রাখা এক পুরানো নৌকা মেরামতের জন্যে রয়েছে। শ্মশান-বৈরাগ্যের মতো একটা কিছু হল বোধ হয়—কুন্তল-দা ঐ নৌকার উপর চুপচাপ বসে মড়া-পোড়ানো দেখতে লাগলেন। মানুষ-জন কেউ নেই এ দিকটায়, শ্মশানের আমগাছ তলায় অনেকে তামাক খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে, সে সব অল্প কানে আসছে। হাটুরে লোকও সব চলে গেছে; একটি দল কেবল কি জন্য পিছিয়ে পড়েছিল, তারাই হন্-হন্ করে যাচ্ছিল। চিতা দেখে একজন বলে, ও মুচিপাড়ার আমদানি। পাড়াটা সাফ হয়ে গেল গো! ওলাবিবি রোজ তিন চারটে করে নিচ্ছেন।

আর একজন বলে, গুণে দেখ্ তো রে—মানুষ আমাদের ভিতর যেন কম হয়ে যাচ্ছে!

যেন বাড়ে না, সেইটে ভাল করে নজর রাখিস। মাঝে মাঝে ওঁরাই আবার পেছু নেন কিনা!

তার পর খুব একটা উদ্বিগ্ন স্বর। সত্যি, মিলছে না তো! মানুষ যে এগার জান।

তিনবার গোণা হল।

তাই তো, তাই তো! বেশ খানিকটা গোলমাল উঠল। শেষে একজন বলল, দূর বোকারা—নিজেকে বাদ দিয়ে সব গুণছিস যে!

কিন্তু তা সত্ত্বেও রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। কুন্তল-দা অন্ধকারে না দেখেও শব্দ-সাড়ায় টের পাচ্ছেন, এ ওর পাশ কাটিয়ে আগে যেতে চাচ্ছে; শ্মশানের এইখানটায় কেউ পেছনে থাকবে না। কুন্তল-দার ছেলেমানুষি চাড়া দিয়ে উঠল, তা ছাড়া ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। নাকি সুরে বলেন, এঁই, আঁমার কিছু দিয়ে যাঁ। আঁমি খাঁবো।

আর যায় কোথায়, তুমুল চিৎকার!···কে কার ঘাড়ে পড়ে, কাঁধের ধামা-ঝুড়ি কতকগুলো ঠিকরে পড়ল। শ্মশানে মড়া পোড়াচ্ছিল, সেই লোকগুলো 'কি' 'কি'—বলতে বলতে এই দিকে ছুটিল।

নাঃ, থাকতে দিল না আর। নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে কুন্তল-দা দৌড় দিলেন। পায়ে ঠেকল আনারস, অকালের ফল, কে আশা করে কিনেছিল। সেদিন পাটক্ষেতের ভিতর নারিকেল-পাতার গদিতে বসে সমারোহে আনারস-ভোজ চলল।

বিনয় এসে বলে, আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? রামচরণ বলল, কি নাকি বড্ড জরুরি ব্যাপার।

সুরমা বলে, এই আমার দাদা···আলাপ করিয়ে দেব।

বিনয় হাসিমুখে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দেয়।

সুরমা বলে, না—সেই যে অতি-নমস্যের জন্য আপনাদের একরকম মিলিটারি-স্যালুট আছে···আমার দাদা কি সাধারণ মানুষ?

কুন্তল-দা রাগ করে ওঠেন, আবার?

বিনয় চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে। কুন্তল-দা বলেন, বিশ্বাস করবেন না ও-সব নিন্দুকের কথা, সামান্য মানুষ ছাড়া আর কি! আমি কুন্তল সরকার, ধরা দেবার জন্য ছটফট করে বেড়াচ্ছি।

বিনয় বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে। তারপর হেসে বলে, তাই যদি হয়—ভাগ্যে আমার পদোন্নতি আছে দেখছি।

আজ থাকতে পারে না, বিনয়ের কানে কানে বলে, খুব—খু-উ-ব! বেশ হিসেব করে সমঝে চলো দিকি, রাঙা-দির খোপাসুদ্ধ মাথাটা গড়াতে গড়াতে তোমার শ্রীপদযুগলের নিচে গিয়ে পড়বে।

বিনয় বলতে লাগল, কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না কুন্তল-দা। আপনার এরকম সুবুদ্ধি—অনুতাপ নাকি ?

অনুতাপ ? রুগ্ন অশক্ত কুন্তল-দার চোখ জ্বলে ওঠে। বলেন, পাপ করলে অনুতাপ আসে, পাপ তো করি নি !

প্রবল কাসি এসে কথা আটকে যায় ; সুরমা ছুটে এসে বাতাস করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে কাসি থামল, তখন তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

সুরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, বিনয়বাবু, দাদা আমার বিশ্রাম দিতে চান। কাল তো আপনি কলকাতা যাচ্ছেন, ওঁকে নিয়ে যান। তাহলে নির্বিঘ্নে যেতে পারবেন। এ আপনি সহজে পারবেন।

বিনয় সভয়ে বলে, বাপরে !

পারেন না ?

বিনয় বলে, পারি, কিন্তু উচিত হবে না। আর ইনি নিজেই যখন জেলে যেতে প্রস্তুত—

সুরমা রাগ করে বলে, কিন্তু আমরা তো নই।

রাগ দেখে কুন্তল-দা হাসতে লাগলেন। শান্ত কণ্ঠে বলেন, ঐ দেখ বোন, মিছেমিছি ঝগড়া বাধাচ্ছ। একটা-দুটো কুন্তলের জন্য ব্যস্ত হবার দিন কি আছে ? বীরপূজা ততদিন চলে, যখন এক আধটা মানুষকে আলাদা করে বেদীর উপর তোলা যায়। এ রকম কুন্তল সরকার এখন যে ঘরে ঘরে ! ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

বিনয়ের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, অনেক ভেবে চিন্তে এই মতলব করা গেছে বিনয়বাবু। অকেজো হয়ে গেছি, এবার সরকার বাহাদুরের ঘাড়ে চেপে পড়াই ভালো। খেয়েদেয়ে স্ফূর্তি করে দিন ক'টা বিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

সুরমার রাগ বেড়ে যায়। জেলখানা পিজরাপোল নাকি?

কুন্তল-দা বলেন, ঠিক তাই। যে গরু লাঙ্গল বয় না, কোন দিনই বইতে পারবে না, তাকে পিজরাপোলে দিতে হয়। এই রোগা দেহটা নিয়ে অপরের কাঁধে চেপে থাকি কোন্ লজ্জায় বল তো বোন?

সুরমা বলল, বিনয়বাবু, আপনার উপরওয়ালারা গোটা মানুষটিকে চাচ্ছেন, শুধু ঐ হাড় ক'খানা নিশ্চয় নয়। তা ছাড়া আপনি তো বলেছেন, এঁদের উপর চার্জ কিছু নেই।

তা বটে! বিনয় চুপ করে ভাবতে লাগল। শেষে বলে, আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।

সুরমা বলে, আপনিও বুঝে দেখুন। বরানগরে ওঁর মা রয়েছেন। আমরাও ফিরে যাচ্ছি, আর কদ্দিন থাকব এখানে? আরও ভাই-বন্ধুরা আছেন! কুন্তল-দার জন্য না হলেও, উনি মায়ের এক ছেলে—মায়ের কথাটা ভাবতে হবে তো!

বিনয় বলল, তাই-ই ঠিক রইল। আপনি যখন বলছেন।

বিনয় চলে গেলে কুন্তল-দা বললেন, শেষ পর্যন্ত ঘরেই পাঠালে?... এখনও জ্বর এলো না; আজ খাসা লাগছে। আজকাল এসরাজ বাজিয়ে থাক, সুরমা?

কেন বাজাব না? আপনার ভয়ে নাকি? দিন-রাত বাজাই।

কুন্তল-দা আপন মনে হাসতে লাগলেন। বলেন, সুরমা, একদিন তোমার আঙ্গুলে আলপিন ফুটিয়েছিলাম। কি পাগলই ছিলাম তখন। সে সমস্ত ভুলে গেছ, না?

হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলেছি বই কি! এ কি আপনারা যে, কাঁটার দাগ চিরজীবনে মিলায় না?

সুরমার ঠোঁট দুটি থর থর করে কেঁপে উঠল, সে মুখ ফেরাল।

কুন্তল-দা আবার জিজ্ঞাসা করেন, বিয়ে হয়ে গেছে নাকি ?

কেন হবে না শুনি ? আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির নই।

আভা বলল, হয় নি এখনও, হবে। সাতাশে অগ্রহায়ণ—ঐ বিনয় দাদার সঙ্গে। পাকাপাকি হয়ে যায় নি অবিশ্যি।

কুন্তল-দা ভয়ানক খুশি হয়ে উঠলেন। বলেন, বেশ, বেশ! আমাকে নেমন্তন্ন কোরো কিন্তু! কলকাতায় হবে নিশ্চয়। সন্দেশ রসগোল্লা, চপ, কাটলেট,—কতদিন খাই নি ওসব।

সুরমা সামলাতে পারল না, ছুটে পালায়।

সেই পুরানো ঘর, পুরানো তক্তাপোশ, গলির ধারে পুরানো জানলাটি। আমরা সবাই আবার জুটেছি। হিরণ, আকবরআলি, নবীন—সকলে আসে। সুরমাও রোজ অন্তত একটিবার এসে দেখে যায়।

সকালবেলা কেউ নেই, একলা আমি মাথার কাছে বসে বাতাস করছিলাম। কুন্তল-দা বাইরের দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন। মৃদু পায়ে এসে ঘরে ঢুকল সুরমা।

এসো বোন, এসো···মানুষ না দেখলে ভাল লাগে না। কোথায় যাব, মানুষ সেখানে আছে কি না আছে, তাই ভাবি। উঁহু, বিছানার উপর নয়, চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো।

সুরমা নত মুখে বলে, আমি যে নেমন্তন্ন করতে এলাম।

তা বটে···সাতাশে এসে পড়েছে। আমার ক্যালেণ্ডারের পাতাটা ছেঁড়া হয় নি। প্রজাপতি-মার্কা চিঠি আরও দুটো এসেছে। ঐ সাদা বাড়িটায় মেরাপ বাঁধছে, জানলায় বসে বসে দেখি।

হাসিমুখে সুরমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, হাঁ বোন, তোমরা যেন দল বেঁধে ষড়যন্ত্র করেছ সাতাশের পর কুমার-কুমারী কেউ আর থাকবে না ?

সুরমা বলে, আপনাকে যেতে হবে কিন্তু।

আমি? ডাক্তারে কি বলে শোন নি? বিয়ে-বাড়ি, আত্মীয় কুটুম্বেরা আসবেন, তার মধ্যে তো যাওয়া চলে না। আমি এখানে থেকেই আশীর্ব্বাদ করব।

সুরমা বলে, না—বোনের কাছে ভাই যাবেই, আত্মীয়-কুটুম্বের অপছন্দ হলে তাঁরা আসবেন না। আমি সাবধান করে নিয়ে যাব, খুব যত্নে রাখব। দু'দিন আগে যেতে হবে আপনাকে।

কুন্তল-দা বললেন তোমার এসরাজ সেই অবধি পড়ে রয়েছে, সুরমা। ধূলোবালি জমে গেছে, নিয়ে যাও। কেন বাজাবেনা—কি হয়েছে? বিশেষ এই আমোদের সময়।

ধরা-গলায় সুরমা বলে, নিয়ে যাব দাদা, লোক পাঠিয়ে দেব।

তাই দিও। আমার উপর রাগ করে আছ সেই থেকে? আরে, আমি একটা পাগল।

সে যাবার পর আরও কতক্ষণ এসেন্সের মাদক সৌরভে ঘরের বাতাস মন্থর হয়ে রইল। মা এসে বললেন, এমন চুপ চাপ শুয়ে আছিস কেন বাবা? একটু ঘোরাফেরা করা তো ভাল।

কুন্তল-দা বললেন, ঘুরতে ভাল লাগে না মা।

আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, শঙ্কর, সেই আগেকার মতো ওকে টেনেটুনে নিয়ে চিলের ছাতে নিয়ে বোসো না কেন? রাতদিন পড়ে থাকে। দেখে আমার যে দমবন্ধ হয়ে আসে।

কুন্তল-দা বললেন, অভ্যাস করে নাও মা। ছাতে বসে শলা-পরামর্শ কতকাল ধরে তো হল, এবার বন্ধ হয়ে গেল, ঠেকাতে পারলে না—তুমি না, তোমার আর ছেলেরা না, ডাক্তারেও নয়।

মা চেয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে, আমিও দেখছি। মুখখানা কি পাংশু

দেখাচ্ছে—স্থির প্রভাহীন চোখ দু'টি কোন দুর্নিরীক্ষের দিকে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

যেন আমাদের কুন্তল দা চেয়ে চেয়ে দেখছেন, জীবনের অপরূপ বৈচিত্র্য। কত আশা কত আনন্দ মঞ্জরিত ফুলের মতো ধরণীর মটিতে ঝরে ঝরে পড়ছে। কত রৌদ্রালোক, মেঘমেদুর আকাশের কত স্বপ্ন মানুষের চোখে! মৃত্যু-পথিক শীতল তুহিনাচ্ছন্ন পথ থেকে ডান হাত তুলে আগামী দিনের সুখী ধরিত্রীকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

সুরমা বিয়েয় নিয়ে যাবে কি, তার দিন তিনেক আগে থেকেই কুন্তল-দা একেবারে সংজ্ঞাহীন। ডাক্তার, মা আর আমরা দিনরাত পালা করে পাশে আছি। সন্ধ্যার দিকে একবার কুন্তল-দার জ্ঞান হল। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কে কে আছ তোমরা?

সবাই।

সুরমা, এসরাজ নিয়ে এসেছ?

কে জবাব দেবে? আজকে বিয়ের দিন, তার কাছে কি খবর পাঠানো যায়? আমার ছাঁৎ করে মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগেকার সেই বিকালবেলার কথা। আমরা আটজন ছিলাম—আজও সবাই আছে, এসরাজও আছে, সুরমা নেই। কুন্তল-দা চিৎকার করে উঠলেন, সুরমা, আর ইউ দেয়ার? স্পিক!

ঝনাঝন এসরাজ বেজে ওঠে। তীব্রগতিতে আঙ্গুল চালাচ্ছি। আর কখনো বাজাই নি, অনভ্যস্ত আঙ্গুল ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন, তবু বাজাতে হবে। শক্ত শক্ত অনেক কাজ করেছি জীবনে, কিন্তু আজকের এই বাজানো কঠিনতম কর্তব্য। সুরের ঝঙ্কারে ঘর ভরে উঠল। মৃত্যুপথযাত্রীর বিশীর্ণ মুখে হাসি ফুটে উঠল।

গো অন, গো অন, স্থরমা—

শান্তমুখে মা গরম জলের সেঁক দিচ্ছেন, সকলে নিঃশব্দে ফাই-ফরমাশ খাটছে। তারপর গম্ভীর গলায় ডাক্তার বলে উঠলেন, স্টপ—

বাজনা থামালাম।

ডাক্তার বললেন, আর কাজ নেই, আর শুনবেন না ইনি।

তিনি ও-ঘরে সাবান নিয়ে হাত ধুতে গেলেন। এসরাজটা খাপে ভরে ধীরে ধীরে কুন্তল-দার মাথার কাছে রাখলাম। ঘরে ম্লানায়মান আলোয় অকস্মাৎ মনে হল, শুধু স্থরমাই নয়—আনন্দকিশোর, নিরুপমা, জগৎ দত্ত, সরোজ, হিরণ, রাণী—সবাই আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আমরা দল শুদ্ধ এসেছি।

•

## মল্লিকা

মল্লিকার কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করি।

স্বদেশী আমলে আমি ছেলেমানুষ, ইস্কুলে পড়ি। বাবা চাকরি ছেড়ে তো ক্ষেপে উঠলেন। সে গল্প গোড়ায় বলেছি। নিশান উড়িয়ে দল বেঁধে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে সভা করতে যেতেন, বক্তৃতা করতেন। বাড়ির কাজকর্ম্ম সব দেখত যদু, জাতে নমঃশূদ্র, আসল কর্তা যেন সে-ই।

একদিন খুব সকালে বাবা আমাকে ডেকে তুললেন। যদু ও বাড়ির আরও অনেকে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। হলদে রঙের এক-এক টুকরা স্থতো নিয়ে তিনি সকলের হাতে বেঁধে দিলেন। বললেন, আমার হাতেও তোমরা কেউ বেঁধে দাও—যদু তুমিই দাও। কলমের খোঁচায় ওরা দেশের মাটি ভাগ করেছে, তা বলে মানুষ আমরা কি পৃথক হয়ে যাব?

সারা সকালটা ধরে কোলাকুলি চলে। যদু কিন্তু মোটের উপর খুশি

নয়। সে বলে, দেখ বাবু, চাকরি ছেড়ে এই সব তো করে বেড়াচ্ছ, উদিকে ছিঁটেফোঁটা যা আছে—আদায়পত্তোর কিছু হচ্ছে না, বিষয়-আশয় চুলোয় যাবে কিন্তু। এই সব হাঙ্গামের দরকারটা কি শুনি?

বাবা বলেন, দরকার নেই? আচ্ছা বাপু, তোর ছাঁচতলায় বেড়া দিয়ে কেউ যদি ছুটো ভাগ করে বলে, এ-দিক্‌টায় তুই থাকবি, ও-দিক্‌টায় মানী থাকবে—চুপ করে থাকতে পারিস? আমরা ঝগড়াঝাঁটি করি, ভাব করি নিজেরা করব—তুমি বাপু কে হে, বাইরে থেকে মাতব্বরি করছ?

এর অনেকদিন পরে আর কিছু বড় হয়ে বাবার বক্তৃতা শুনেছি। তার এক-একটা কথা আজও যেন গান হয়ে কানে বাজে। মানুষের বিজয়-ঘোষণা···আঘাত-অপমানের মধ্যে মাথা উঁচু করে বেড়ানোর সঙ্কল্প···এমনি ধরণের সব কথা।

তারপর মল্লিকা এল। ষোল-সতর বছরের অজানা অচেনা মেয়ে—সর্বাঙ্গভরা রূপ আর একমুখ হাসি···সে হাসি কারণে-অকারণে ঝরণার জলের মতো ঝরে পড়ে। নূতন মেয়ে পেয়ে বাবারও বাইরের ঘোরাঘুরি খানিকটা কমে এল।

একবার রাখিবন্ধনের দিন সকাল সকাল স্নান করে আমরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছি।

কই বাবা, রাখি বাঁধবে না?

বাবা হেসে বললেন, মনে মনে সব বাঁধন পড়েছে কিনা—টুকরো দেশ তাই জোড়া লেগে গেছে, বাইরের রাখির আর দরকার নেই। একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন, ম্যাকলিন সাহেব কুন্তলের কথা শুনে বলেছিল, ফুলের মতো নরম দেহ, কিন্তু ভিতরটা যেন

ইস্পাত—এই সব ছোকরা এ-দেশে এল কি করে রায়? আমি জবাব দিলাম, সাহেব, রয়াল-বেঙ্গল-টাইগারের দেশ এটা—জগতে এদের জুড়ি নেই।

আনন্দে গৌরবে বাবার গৌর মুখখানি জ্বল-জ্বল করতে লাগল।

তারপর তিনি গত হলেন। আইন পড়ার নাম করে তখন কলকাতায় আছি। কিন্তু সে তাহা মিথ্যে—কলেজ মুখোই হইনে। মল্লিকার সম্বন্ধে যে নেশা লাগে নি এমন নয়। স্বদেশী করি বলে কি মানুষ নই? শনিবারে শনিবারে প্রায়ই বাড়ি আসি। আরও সুবিধা হল, আমার উপর একটু বিশেষ কাজের ভার পড়ল, কাজটা আমাদেরই ঐ অঞ্চলে।

আমার ধরণ ধারণ যদুর ভাল লাগে না। সে কটমট করে তাকায়। কৈফিয়ৎ হিসেবে বলি, যদু ভাই, একা-একা তুই ক'দিক সামলাবি? আমার তো একটা বুদ্ধি বিবেচনা আছে। তাই আসা-যাওয়া করছি।

কাঠখোট্টা যদু এ-সব কথায় ভোলে না, ঘাড় নেড়ে সোজা জবাব দেয়, না ভাইধন, আমার সুখে কাজ নেই। এ রকম ইস্কুল-পালাপালি করো না আর, মানুষ হয়ে এসে একেবারে আমায় ছুটি দিও।

কিন্তু আসা বন্ধ করবার জো নেই যখন, যথাসম্ভব তাকে পাশ কাটিয়ে বেড়াই।

একবার সোমবারের দিন সকালবেলা ঠিক ফেরবার মুখে মেঘ করল, ঝড়-জল হওয়া অসম্ভব ছিল না। স্টেশন প্রায় মাইল চারেক পথ—ও-রকম অবস্থায় কাপড়-চোপড় ভিজে গেলে কলেজ যাওয়া চুলোয় যাক • বড় রকম একটা অসুখ-বিসুখও হতে পারত। কিন্তু যদু এসব

বুঝবে না। দুপুরে খাওয়ার সময়টা মুখোমুখি পড়ে গেলাম। যদু বলে, এবারে পুরোপুরি ইস্তফা দিয়ে এলে ভাইধন? তা ভাল—নিজের কাজকর্ম নিজে দেখ গে, আমি সরে পড়ি।

অপরাধীর ভাবে বলি, আচ্ছা, এই অবস্থায় যাই কি করে, বুঝে দেখ—

যদু বলে, ও, চিড়িয়াখানার খাঁচা ভেঙে বাঘ বেরিয়েছে বুঝি? শহরে আর যাবার জো নেই—

আমার রাগ হয়ে গেল। বলি, হ্যাঁ, বেরিয়েছে—বেরিয়ে তার দুটো এসে এই গাঁয়ে ঢুকেছে। তুই সেই সকাল থেকে তক্কে তক্কে আছিস, আর ওদিকে ঘরের মধ্যে আর এক নম্বর তিনি ওৎ পেতে রয়েছেন।

যদুর মুখ হাসিতে ভরে যায়। তবেই দেখ ভাইধন, আমার একরত্তি ঐ বউঠাকরুনের—খালি বিদ্যে নয়' বুদ্ধিও কত! বুকের উপর থাবা দিয়ে সগর্বে বলে, আমি—এই আমি খুঁজে পেতে এনেছিলাম, ঠাকুর আমার মান রেখেছেন।

তোর আর তোর বউঠাকরুনের জ্বালায় আমি দেশান্তরী হয়ে যাব, মোটে বাড়ি আসব না।

যদু ভয় পায় না, মহানন্দে বলে, এই তো! বাপের বেটা হও, ভাইধন। কর্তাই বা ক-দিন বাড়ি থাকতেন! কত বিদ্যে শিখিয়েছিলেন, শেষকালে তাই তো মানুষ কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে এসে কথা শোনবার জন্য ধরে নিয়ে যেত। হুঁ-হুঁ—বাড়ি থাকলে তোমাকে সেরেস্তায় বসতে হবে, হাটবাজার করতে হবে—

এই সময়টা এক কাণ্ড হয়ে গেল। যদুর ম্যালেরিয়া ধরেছিল। দিনদশেক ভুগে সবে ভাত খেয়েছে, ফসল কাটার সময়, নিতান্ত না দেখলে নয়—মাঠের দিকে যাচ্ছিল সেইসব তদারক করতে। থানার

উপর দিয়ে রাস্তা। দেখে, গোকুল মোড়ল আর তার ভাইপো শুকনো মুখে বসে আছে ; সামনে চেয়ারের উপর দারোগাবাবু। একটা কথা কাটাকাটি চলছিল। গোকুল সম্পর্কে তার পিসতুত ভায়রাভাই—ভাব-সাবও আছে। হাত নেড়ে গোকুল তাকে ডাকল। যদু বারাণ্ডায় উঠে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, সকালবেলা পীঠস্থানে—কি হয়েছে রে ?

গোকুল বলে কাল রাত্রে আমার সর্বস্ব চুরি গেছে। দক্ষিণের ঘরে সিঁদ কেটেছে, আবার রান্নাঘরেরও হাত-দেড়েক বেড়া খসিয়ে ফেলেছে—পিতল-কাঁসা ঘরে এক টুকরো নেই। আজকে কলার পাতায় ভাত খেতে হবে।

দারোগা ঘাড় নেড়ে বললেন, যা-বলো মোড়লের পো, হিসেব করে দেখলাম পাঁচটা টাকার কম কিছুতে হয় না। এখন না পার, বরঞ্চ দুপুরের ইদিকে জমা দিয়ে যেও— নির্ভাবনায় যাও, নাগাদ সন্ধ্যা আমরা গিয়ে হাজির হব !

গোকুলের চোখ ফেটে জল বেরুবার মত হল। হুজুর, বিশ্বাস করছেন না—কি আর বলি ! ঘরে একটা তামার পয়সা অবধি রেখে যায় নি। যদুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, এই এজাহার দিতে এসে বড্ড মুশকিলে পড়লাম। দারোগাবাবুর নিজে না গেলে কিছুতে হবে না, অথচ কোথায় তার পালকি-ভাড়া, কোথায় কনেস্টবলের বার-বরদারি,—এত টাকা এখন পাই কোথায় ?

বাবার সঙ্গে যদু ঝগড়া করত, তবু তাঁরই ভাতে মানুষ। কে জানত, তলে তলে তাঁর বিদ্যা সে আয়ত্ত করেছে ! যদুর মুখ কালো হয়ে উঠল। উগ্র কণ্ঠে বলে, কেন, তোমার গরু-বাছুর নেই গোকুল ?

দারোগার দিকে তাকিয়ে বলে, সে তো ঠিক কথা। চোরেরা এত

নিয়ে গেল, আর হুজুরের বেলায় ফক্কিকার? উনি না গেলে হবে কি করে? গরু বন্ধক দিয়ে রাহা-খরচের যোগাড় করোগে—

দারোগা আগুন হয়ে উঠলেন। তুমি কে হে ফাজলামি করতে এসেছ? বেরোও—এই মহাদেব সিং, নিকাল দেও উসকো—

যতু উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, আমরাই যাচ্ছি। সোজা সদরে চলে যাব, সে-পথ চিনি। বল ভাই, বন্দে মাতরম্—

দারোগা হাঁকলেন, সদরে আমরা পাঠাব। তোদের চিনে যেতে হবে না। পাকড়ো—

তুপুরের পর গোকুল এসে চুপি-চুপি মল্লিকাকে বলে গেল, যতুকে নিদারুণ মার মেরেছে, মেরে এখন অতুল ডাক্তারের উঠানে দেবদারু গাছে বেঁধে রেখেছে।

অতুল ডাক্তারের বাড়ি থানার লাগোয়া। ডাক্তারের সঙ্গে দারোগার গলায় গলায় ভাব এবং কু-লোকে রটনা করে, ভালবাসাটা নিতান্ত নিষ্কামও নয়। মল্লিকা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যায়। পাড়ার তু-চার জনের চেষ্টায় সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হল। মল্লিকা চাদরে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে থানায় চলল, সঙ্গে যতুর মেয়ে মানী আর এক জ্ঞাতি-ভাস্থরের ছেলে। আসামীকে তখন গারদঘরে রাখা হয়েছে। পিছনে উত্তরের রোয়াকে মল্লিকারা বসল।

হাতকড়ি-লাগানো যতুর চেহারা দেখে মল্লিকার চোখে জল আসে।

এ কি করে বসলে মোড়ল-দাতু?

স্বর্গীয় কর্তার কথাগুলিই যতু মুখস্থের মতো বলে যায়।

কেন, অন্যায়টা কিসের? বন্দে মাতরম্ বলেছি, মাকে ডেকেছি—ছেলের মুখ চেপে ধরে মাকে ডাকতে দেবে না, এ আমরা মানব কেন?

দফাদার করালীচরণ এই গ্রামের বাসিন্দা, শঙ্করদের সদর-পুকুরের ধারে বাড়ি। তাকে ডাকিয়ে এনে মল্লিকা বলে, মোড়ল-দাদুকে এবার ছেড়ে দাও। সবে জ্বর থেকে উঠেছে, দুর্বল শরীর—তার উপর দুপুরে কিছু খায় নি—

করালী বলে, দেমাক করে খায়নি। চিঁড়ে দেওয়া হল, তা ছড়িয়ে ফেলল। বুঝে দেখ তো মা, থানার 'পরে এসে হল্লা করে—ওর সাহসটা কি! বড়বাবু ওকে সদরে চালান দেবেন। দিন কতক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মল্লিকা আশ্চর্য হয়ে বলে, বন্দে মাতরমের জন্য জেল?

করালী হেসে ওঠে।

কি জানি, কি জন্যে! তুমি মা, ঘরে যাও, ওকে ছাড়া হবে না।

যদুও বলে, ঘরে যাও বউঠাকরুন। এরা কি সহজে ছাড়বার লোক? দুপুরে কতকগুলো সাক্ষী এনে কি-সব তালিম দিচ্ছিল—একটু একটু কানে গেল। আমি নাকি ভয়ানক সব কাজ করেছি। তুমি ভাইধনকে চিঠি লিখে দিও। মাস পাঁচ-ছয় পরেই আসছি—ভাবনা নেই।

মল্লিকা চোখ মুছে বলে, সদর তো দশ-বারো ক্রোশ পথ। মোড়ল-দাদু এই রোগা শরীরে যাবে কিসে?

করালী হাসতে লাগল। বলে, আসামীর জন্যে কি পক্ষীরাজের বন্দোবস্ত হবে? এই—জোছনা উঠলে রওনা হবে, সঙ্গে চার-পাঁচ জন কনেস্টবল থাকবে, পৌঁছতে দুপুরও লাগবে না। দারোগাবাবু সকালে পালকিতে রওনা হবেন, বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

মল্লিকা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমার মোড়ল-দাদুও পালকিতে যাবে।

করালী দাঁত বের করে হাসে। বলে, ষোল বেহারার?

তা দূরের পথ—বেহারা কিছু বেশি চাই বই কি!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে করালী হাসির জের টানতে সাহস পায় না। বলে, আচ্ছা মা, দারোগাবাবুকে বলিগে—

হ্যাঁ, বলোগে। রোগা মানুষকে বারো কোশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলে হাড় ক'খানাও আস্ত থাকবে না। সে হবে না। তুমি বলো, পালকির খরচা আমরাই দেবো।

রাত্রিবেলা থানা থেকে খবর এল, পালকির সম্বন্ধে দারোগাবাবুর আপত্তি নেই, সকালেই রওনা হবে। তবে বারোটা বেহারার দরুন চব্বিশ টাকা এক্ষুণি পাঠিয়ে দেওয়া চাই।

পাড়াগাঁয়ে যখন-তখন অত টাকা মেলে না। মল্লিকা হাতের একগাছা বালা খুলে যত্নর মেয়ের হাতে দিল। বলে, পোদ্দারের দোকানে ছুটে যা মানী, বন্ধক দিয়ে, বিক্রি করে, যে ভাবে হোক—টাকা নিয়ে আয়।

বালা হাতে মানী ইতস্তত করে। মল্লিকা তাড়া দিয়ে ওঠে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি, মানুষের চেয়ে কি গয়না বড় ?

তা অবশ্য নয়, এবং বালা নিয়ে মানীও চলে গেল। তবু মল্লিকা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুস্থির হতে পারে না। এই বালা তার শাশুড়ী হাতে পরতেন, সেকেলে জিনিস। শাশুড়ীকে সে চোখে দেখে নি—তিনি চিতায় উঠলে কর্তা খুলে রেখেছিলেন, মল্লিকা এলে তাকে পরিয়ে দেন। আবার সে যেদিন চিতায় উঠবে, হয়তো আর একজন সজল চোখে খুলে রেখে দিত। কিন্তু সে তো হল না—

আমার কাছে মল্লিকা চিঠি লিখল। সব কথাই খুলে লিখেছিল। তিন দিনের দিন বাড়ী এসে পৌছলাম।

হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে মল্লিকা বলে, দেখ, তুমি রাগ করবে—

ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে বসলাম, সব লিখেছি—সেইটে কেবল লিখি নি।

কি ?

মল্লিকা বাঁ-হাতখানা উঁচু করে দেখাল।

হাসিমুখে বলি, গয়নার শোক লেগেছে ?

অশ্রুজড়িত স্বরে মল্লিকা বলে, এ যে আমার হীরে-মাণিক-কোহিনুরের চেয়ে বেশি। তুমি তো জান···আচ্ছা, অন্যায় হয় নি আমার ?

নিশ্চয়, এক-শ বার—

মল্লিকা এতটুকু হয়ে যায়, বলে, বাবা বেঁচে থাকলে কত দুঃখ করতেন তিনি !

দুঃখ করতেন, তবে রাগ করতেন না মল্লিকা। এ ছাড়া যে কোন উপায় ছিল না।

বাবার কথা উঠলে গর্বে বুক ভরে যায়। স্বাধীনতা আমরা অনেক কাল হারিয়েছি, কিন্তু মনে মনে আজও মরি নি—সে কেবল ঐ নমস্যেরা প্রাণের আগুন পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে জ্বালিয়ে যাচ্ছেন বলে। বললাম, বাবা যা মানুষ—হয়তো বলতেন, বউমা, এ তুমি কি করেছ—মানুষের হাতে হলদে রাখি পরিয়ে পরিয়ে বেড়াতাম, তুমি যে একটা হাতের বালা খুলে একসঙ্গে হাজার মানুষের মনের উপর রাখি পরিয়ে দিলে !

মল্লিকা লজ্জিত হয় একটু। বলে, এই দেখ, তোমার কানেও গেছে তা হলে। সত্যি এই অঞ্চল জুড়ে আমি মা হয়ে বসেছি।

তাইতো বলছি, ঘোরতর অন্যায়। আমি বেচারা কিছু খবর রাখি নে, কলকাতায় বসে পেনাল-কোড মুখস্থ করে মরি। এখন পথ

চলতে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ঐ মল্লিকা-মায়ের স্বামী যাচ্ছে। এতে ইজ্জত থাকে ?

মল্লিকা ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে। বেশ হয়েছে —এতকাল তোমরা মাথায় চড়ে থাকতে, এখন থেকে আমার নামে তোমার পরিচয়।

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, ইজ্জত আমি বজায় রাখবই।

কি করবে ?

একলা তোমায় দেমাক করতে দেব বুঝি! আমিও পাশে পাশে থাকব। হাজার মানুষের মধ্যেই এখন থেকে আমার কাজ।

আদর করে তাকে কাছে টেনে আনলাম। বলি, বাবার ঐ ছবির সামনে যেমন ছোট্ট এতটুকু তুমি এই আমার বুকের মধ্যে রয়েছ, তেমনি থাকবে রোজ—চিরকাল—বুড়ো হয়ে মরে যাওয়া অবধি। লোকে বলবে —নীলকান্ত রায়ের ছেলে ঐ শঙ্কর, রায়-বাড়ির বউ ঐ মল্লিকা···কেমন ? বাবার কাজ - এখানকার সকল মানুষের কাজ, আর আমি একা নই— দু-জনে মিলে করব আমরা।

মল্লিকা তদ্গত চোখে ছবির দিকে চেয়ে থাকে, তার পর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করতে আসে। দেখ কাণ্ড, মেয়েরা এত অল্পে অভিভূত হয়ে পড়ে !

তাকে ধরে ফেললাম।

রাগে রাগে থানায় গিয়ে উঠি। দারোগাকে বললাম, আপনি নতুন এসেছেন, জানেন না। যদু-মোড়ল আমার বাড়ি থাকে, ওর বাপও আমাদের কাজ করত—

দারোগা আপ্যায়ন করে বসালেন। বলেন, এসে পড়েছেন, বেশ

হয়েছে মশাই। আমাদেরই বা গণ্ডগোলের গরজ কি? তবে এ-ও বলি, ছাইভস্ম কেস—এতদূর কি গড়াত? কথায় বলে, স্ত্রী-বুদ্ধি··· তাঁরা পালকি-বেহারার টাকা জোগাতে পারলেন, কিন্তু কনেস্টবল-গুলোর দরুণ কিছু ধরে দিলে তখনই যে খতম হয়ে যেত। ওর আধা খরচও লাগত না মশাই।

ব্যাপারটা কি বলুন তো?

দারোগা বলেন, পিঁপড়েগুলোর পাখনা উঠছে, দেখেন কি? থানায় এসে চেঁচিয়ে গেল—সরকারি আপিস, সরকার এ-সব সায়েস্তা করতে জানে, করবেও। কিন্তু ছোটলোকের এই রকম বাড় বাড়লে ভদ্রলোকেরা টিঁকবেন কি করে, ভাবুন তো। আরে মশাই, নিচু হয়ে নাই যদি থাকবে তো ভগবানকে বলে কয়ে আমার আপনার মতো বামুন হয়ে জন্মাল না কেন?

বললাম, আপনার কাছে ভাগবত-ভাষ্য শুনতে আসি নি দারোগা-বাবু। নীলকান্ত রায়ের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। আপনাদের নেকনজর তো ছিলই, তার উপর খাওয়া-ছোঁওয়ার বাছবিচার নেই বলে সমাজেও তিনি পাঁচ বচ্ছর একঘরে হয়ে ছিলেন। আমি তাঁর ছেলে—যদু চাকর নয়, আমার বড় ভাই।

তা না হলে এই রকম কাঁধে চড়ে বসে! আপনারা দেশটা ডোবাবেন।

রূঢ় কণ্ঠে বলি, আজ্ঞে না, আপনারাই। শুধু দেশ নয়, যে-সরকারের নিমক খাচ্ছেন তাকেও। সোজা কথায় বলি, পান-টান খাওয়ার সিকি পয়সা প্রত্যাশা করবেন না—মিথ্যে মামলা তুলে নিন।

দারোগা চটে উঠলেন। মিথ্যে কি রকম? ডাক্তারবাবুর গাছ থেকে চুরি করে নারকেল পাড়ে নি?

না। তার কারণ, অতুল ডাক্তারের নারকেলগাছই নেই।

আছে না আছে, সে বিচার কোর্ট করবে।

তা করবে। আপাতত আমিও কিছু করে যাই। দারোগার গলায় ছিল কম্ফর্টার জড়ানো, রাগের মাথায় কম্ফর্টার ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে তারপর ছেড়ে দিয়ে এলাম। মাছি মেরে লাভটা কি?

তারপর হুলস্থূল কাণ্ড। যদু ছাড়া পেল, কিন্তু স্বদেশী ব্যাপারে বাবার সুনাম এবং তার সঙ্গে এই ঘটনা যোগ হয়ে নানা দফায় সেবার আমার মোট দেড় বছর জেল হয়ে গেল। সে-আমলের খবরের কাগজেও এ-সব কথা উঠেছিল, একটা কাগজে এক মল্লিকার নামেই দেড় কলম লেখা বেরুল—মল্লিকা-কুসুমের মতো যিনি স্নিগ্ধ সৌরভে গৃহকোণ আমোদিত করিতেন, হতভাগ্য সন্তানবর্গের কল্যাণকল্পে তিনি আজ স্বদেশ-গগনে সাবিতৃস্বরূপ সমুদিত হইয়াছেন, এইবার নবপ্রভাতের অভ্যুদয় হইতে চলিল…ইত্যাদি। মোটের উপর সমস্ত মিলে ব্যাপার এমন গড়াল, যে-বেহারারা যদুর পালকি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারা একদিন এসে পাই-পয়সা অবধি ভাড়া ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সকলের যুক্তি-পরামর্শে বালা বিক্রির টাকায় রায়-বাড়ির মণ্ডপে একটা নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়। কুন্তল-দার ছাতে যেমন আমরা আড্ডা জমাতাম, কতকটা তাই আর কি! চাষারা সন্ধ্যার পর বই সেলেট নিয়ে আসে। মল্লিকা এইসব নিয়ে যেন পাগল হয়ে উঠল; ছোট ছেলেমেয়েদের সে নিজে পড়ায়।

জেল থেকে বেরুবার দিন ছেলেরা যথারীতি ফুলের মালা নিয়ে ফটক আটকে বসে আছে, ভিড় ঠেলে মল্লিকা আর যদু এগোবার ভরসা পায় না। দুটো দিন যে বাড়িতে স্থির হয়ে থাকব, তার ফুরসুৎ দেয় না

তাঁরা; এখানে সমিতি, ওখানে বৈঠক—নিশ্বাস ফেলতে পারি নে।··· আবার পুলিশে ধরে, যথারীতি মামলা-মোকদ্দমার পর জেল হয়।··· শেষাশেষি আর কোর্টের দরকার হয় না, সোজা ডিটেনশন-ক্যাম্পে চালান হয়ে যাই। কুন্তল-দার দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এখন আর এ কথা গোপন ছিল না।

তখন বীরভূমের এক গ্রামে থাকতে দিয়েছিল। পুলিশ দু'বেলা এসে তদারক করে যেত। গ্রামের লোক দস্তুরমতো হিংসা করত আমাকে। কাজকর্ম নেই, খাওয়া-দাওয়া তোফা চলছে, সব সময় ধোপ-দুরস্ত কাপড়। মাঝে মাঝে বাজারে যাই সওদা করতে। মাছওয়ালাকে দর জিজ্ঞাসা করলে সে যদি বলে বারো আনা, ঝনাৎ করে পুরো টাকাটা ফেলে দিয়ে মাছ তুলে নিই, সে অবাক হয়ে থাকে।

একদিন লোকটা চুপি চুপি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করলে এই রকম বন্দীবাবু হওয়া যায়—বলুন তো বাবু? অনেকখানি বিদ্যে শিখতে হয়—না?

বাড়ীর চিঠি আসে মাঝে মাঝে। মল্লিকা নিজের কথা কিছু লেখে না—তা ছাড়া সকল খবরই দেয়। মানীর বিয়ে হয়ে গেছে, জামাইটি লেখাপড়াও জানে একটু-আধটু, সে-ই এখন যদুর বাড়িতে এসে আছে, চাষ-বাস দেখে। যদুকে খুব টানাটানি করছে, তাকে আর আমাদের বাড়ি থাকতে দেবে না···

একদিন মল্লিকার চোখ ফেটে নাকি সত্যি সত্যি জল এসেছিল। মানীই পরে বলেছে এ কথা।

আচ্ছা, তোর বাপকে যে নিয়ে যাবি মানী, এই পুরীর মধ্যে একা-একা আমি থাকব কি করে?

মানী বলে, বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন, আর কত খাটবেন বলো।

তোর বাবাকে বুঝি বড্ড খাটাই ?

মানী সমস্ত জানে, তার লজ্জা হয়। বলে, না খুড়ীমা, তেমন কথা কে বলছে ? আসলে হল, বাবা এখানে থাকলে নানান কথা ওঠে, সমাজে মাথা নিচু হয়ে যায়। তাই তোমাদের জামাই বলেছে, সমাজের সকলকে ছেড়ে দিয়ে তিনটে মানুষ আলাদা থাকা যায় না তো !

জামাইও সঙ্গে ছিল। তার স্বর এরকম মোলায়েম নয়। বলে, কোথায় মানুষ ? আমরা তো তোমাদের কাছে কুকুরের সামিল। আমাদের ঘরে ঢুকতে দাও ?

ম্লান হাসি হেসে মল্লিকা বলে, দিই কিনা, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ দিকি, অমূল্য।

মানী সামলে নেবার ভাবে তাড়াতাড়ি বলল, তোমরা দাও, কিন্তু সবাই দেয় না কিনা—সেই কথাই বলছে খুড়ীমা।

দিন-কাল বদলে যাচ্ছে যে, যারা দেয় না তারাও দেবে।

অমূল্য আগুন হয়ে উঠে। দয়া ? দয়া চাইনে, আমরা আলাদা থাকব। কোম্পানি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, দালান-কোঠা চাকরি-বাকরি সব বখরা হয়ে যাবে···খাসা হয়েছে—

কিন্তু তাতে ভালবাসা হবে না, তফাতটাই শুধু বাড়বে। একটা নিশ্বাস ফেলে মল্লিকা বলে, এদের অনেক দোষ আছে মানি, তবু এদেরই মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে মানুষের অপমান প্রাণ দিয়ে বুঝেছে। এই বাড়িরই একটা লোক সব ছেড়ে-ছুড়ে আজও ভেসে বেড়াচ্ছে···হ্যাঁ রে মানী, আজকাল তোর খুড়োমশায়কে একেবারে ভুলে গেছিস, না ?

মানী লজ্জিত হয়ে সরে যায়। অমূল্য তখন চলল শ্বশুরের কাছে। মণ্ডপের সামনেটায় একটা নিড়ানি নিয়ে যদু ঘাস তুলছিল। সেখানে

আর এক দফা বচসা হল। অনেকক্ষণ পরে রান্নাবান্না হয়ে গেলে মল্লিকা গিয়ে দেখল, যদু ঘাসের উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

মল্লিকা বলে, আর কেন মোড়ল-দাদু? আমরা উঁচু জাত—ওদের যে ঘেন্না করি। কেউ আর ইস্কুলে পড়তে আসবে না, ঘাস তুলে পথঘাট যতই সাফ করে রাখো না কেন—

যদু বলে, তাই তো বউঠাকরুন, নতুন কথা শুনি—তোমরা আর আমরা একেবারে পর, কোন সম্পর্ক নেই—

থাকবে কি করে! কোম্পানি দাগ কেটে মার্কা মেরে দিয়েছে যে! এদিক-ওদিক হবার জো আছে?

সেইদিন মল্লিকা এক চিঠি লেখে আমাকে। যা কখনো হয় নি—দু-শ মাইল দূর থেকে তার কান্না শুনতে পেলাম। চিঠির প্রতিটি অক্ষর যেন কান্না। লিখেছে, অবস্থা ভাল নয়, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। স্বদেশী আমলের কথা শুনেছি, কিন্তু এমন দুর্দিন আর কখনো আসে নি। আবার এদিকে ক্ষেত-খামার খাঁ-খাঁ করছে, ভয়ানক অজন্মা। লোকে এবার খেতে পাবে না···

যদুকে শেষ পর্যন্ত একরকম জোর-জবরদস্তি করেই নমঃশূদ্র-পাড়ায় নিয়ে গেল। মল্লিকা একা থাকে। এক-এক দিন যদু সন্ধ্যার পর গা ঢাকা দিয়ে আসে, বেশিক্ষণ থাকতে ভরসা পায় না, খবরাখবর নিয়ে সরে পড়ে।

একদিন মাস ছয়েক পরে যদু ঘরের মধ্যে এসে চেপে বসল। বলে, ইঃ আমার কুটুম্বেরা! ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই। বুঝলে বউঠাকরুন, দুপুরে আজ লবডঙ্কা হয়েছে।

মল্লিকা শিউরে ওঠে। সে কি?

তিক্ত কণ্ঠে যদু বলে, জুটবে কোথা থেকে? তের বিঘের বড় বন্দটা

পতিত রয়েছে। তার কি চেষ্টা আছে? নবাবপুত্তুর তেড়ি কেটে লম্বা লম্বা বুলি আউড়ে বেড়াবে, সন্ধ্যের পর জুটবে গিয়ে অশ্বিনীনাথের গাঁজার আড্ডায়। গলা নামিয়ে চুপি চুপি বলে, আবার শুনি রাত্তিরে এদিক-ওদিক বেরুচ্ছে; পয়সার খাঁকতি, নেশার টান। শেষকালে জেলে-টেলে না যায়, তা হলে মানীর কষ্টের পার থাকবে না।

মল্লিকা বলে, এই আমার মতো?

যদু নাকি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, হুঃ, তোমার মতো! তুমি তো ভাগ্যধরী বউঠাকরুন, ঐ হারামজাদার কথার মধ্যে তুমি আমার ভাইধনকে টেনে আনলে?

ভাতের থালা সামনে আসতে যদু গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পোরে। কেবল যে দুপুরে খায় নি, সে-রকম মনে হয় না; হয়তো আরও কত বেলা—কতদিন তার ঠিক কি! মল্লিকার মনটা বড় খারাপ হয়ে রইল, রাত্রে খুব জ্বর এল। জ্বর এই রকম প্রায়ই হয়। ভাবনায় ভাবনায় কিছুতে ঘুম আসে না। আলো জ্বেলে তখন আমাকে চিঠি লেখে—আর যেন সে একা সামলাতে পাচ্ছে না। লিখল, কবে আসবে? আমি আর থাকতে পারি নে—তুমি চলে এসো—

এই সময় নূতন ভারত-শাসন আইন পাস হয়, স্বাধীনতার পথে আমরা নাকি বড় একটা লম্ফ দিলাম! বড়লোকের বাড়ির আয়েশি কর্তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। খবরের কাগজে কলমের পর কলম তাঁদের অলৌকিক ত্যাগের বিবরণ বেরুতে লাগল। পুলকে রোমাঞ্চিত হতে হয়,—ডজন ডজন এরকম অবিসম্বাদী দেশনেতা রয়েছেন, ভাবনা কি আমাদের? তাঁদের ভোট জোগাড় করতে আমাদের মতো জেল-ফেরত ছন্নছাড়ার দল কোমর বেঁধে লেগে গেল।

এই উপলক্ষে আমরা কয়েকজন আচাম্বতে ছাড়া পেয়ে গেলাম। আমাদের লাভ এইটুকু। প্রথম যে ট্রেন পাওয়া গেল, তাতে উঠে বসলাম।

সন্ধ্যার পর বড় কনকনে শীত—বাতাসের যেন দাঁত হয়েছে, গ্রামের কুকুরটা অবধি এরই মধ্যে খেজুর-রস জাল দেওয়া উনানের ধারে গুটি-সুটি মেরে শুয়েছে। এমনি সময়ে স্বল্পালোকিত ষ্টেশনে নেমে আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি।

কোথায় যাবেন বাবু?

আমাদের গ্রামের নাম করলাম। বিছানার মোট ও স্যুটকেসটা দেখিয়ে বলি, বোঝা ভারি হবে না।

উঁহু, ভারি কেন হবে? শোলার আটি! চার আনা লাগবে—ষোলটি পয়সা, আধলা কম নয়।

টিকিটবাবু আলো হাতে সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

নতুন লোক দেখেছে, ঠগ-বেটারা অমনি ছুরি শানাচ্ছে। বলি, ষোলটা পয়সা কখনও দেখেছিস এক জায়গায়?···আপনি ব্যস্ত হবেন না, এগিয়ে দেখুন, কত জনে হা-পিত্যেশ করে আছে। চার পয়সা কি বড় জোর ছ'পয়সা।

লোকটা বলে, পাক্কা দু-ক্রোশ পথ, খাল পেরুতে হবে, মোটে ছ'পয়সা?

তাই তো সবাই যাচ্ছে।

তবে আমিও যাব।

বোঝা মাথায় নিয়ে সে দ্রুতপদে চলল।

পাকা রাস্তা ছেড়ে আমরা সুঁড়ি-পথে নামলাম। খুব জ্যোৎস্না

ফুটেছে, মাঠ গাছপালা ঝুপসি-ঝুপসি জঙ্গলগুলো অনেক দিন পরে চোখে অপরূপ ঠেকছে।

তোমার নামটা কি ভাই?

তা-ও ঐ ছ-পয়সার মধ্যে?

চুপ করে যাই। মনে মনে ভাবি, ঐ তো রোগা চেহারার মানুষ, দুটো বোঝা বয়ে খুব কষ্ট হয়েছে, মেজাজ তাই বিগড়ে গেছে। সহানুভূতির সুরে বললাম, এই ইয়ে···স্যুটকেসটা বরং আমার হাতে দাও দিকি।

বিরক্তমুখে লোকটা বলে, তা হলে পয়সাও তিনটে কম দেবে তো?

পথ ছেড়ে এবার সে আমবাগানে ঢুকে পড়ল।

ওদিকে কেন রে?

লোকটি বলে, এইখানে দাঁড়াও বাবু, জল খেয়ে আসি একটু।

এত শীতে জল?

সে রুখে উঠল। জলও খাওয়া যাবে না? বাগানের উদিকে খাল, কতক্ষণ লাগবে!

মনে পড়ল, একটা খালের মতো আছে বটে এদিকে। চৈত্র মাসে একদম শুকিয়ে যায়, বর্ষায় হিঞ্চে-কলমি নিয়ে জেগে ওঠে, জলের চেয়ে শেওলাই তাতে বেশি! ছেলেবেলায় এইখানে দু'চার বার পুঁটিমাছ ধরতে এসেছি।

দাঁড়ালাম। আবার ভাবি, দাঁড়িয়েই বা কি হবে! লোকটার গতিক সুবিধে লাগছে না। বাগানের মধ্যে খানিকটা গিয়ে একটা উঁচু জমি, সেখান থেকে বেশ দেখতে পাওয়া গেল। চেঁচিয়ে ডাক দিলাম, জল খাবি—তা খালের মাঝখানে কি করিস?

আজ্ঞে ঘাটের জল ঘোলা।

কোমর-জল হয়ে গেছে, এখনও এগুচ্ছিস?

জবাব না দিয়ে লোকটা ক্ষিপ্রবেগে শেওলা ছিঁড়ে পথ করতে লাগল। আমি বন-জঙ্গল ভেঙে সোজা খালের কিনারে ছুটলাম। ততক্ষণ সে ওপারে উঠে দৌড় দিয়েছে।

হেসে উঠি। পারবি নে বাপু, সাত বছর আটকা ছিলাম, তা বলে পায়ে বাত ধরেছে ভাবিস নে। আচ্ছা যত জোরে পারিস ছোট্, আমিও ছুটছি।

নূতন করে আর শেওলা ছিঁড়তে হল না, চক্ষের পলকে খাল পার হয়ে প্রায় রশি দুই গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরলাম।

স্যুটকেস ফেলে লোকটা কোমর থেকে বের করল এক ছুরি। ধস্তাধস্তি চলল খানিকটা। হেসে বললাম, ও-ছুরিতে মাছ কোটা যায়, মানুষ কাটা যায় না, বুঝলি? হাত ধরে মুচড়ে দিতে ছুরি পড়ে গেল, লোকটা আর্তনাদ করে উঠল।

গ্রামের ধারে এসে পড়েছি। চেঁচামেচিতে লোক জুটে গেল।

কি হয়েছে? কি হয়েছে?

লোকটা অসঙ্কোচে বলে, মেরে ফেলেছে ভাই রে, হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। তেষ্টার জল খেতে দেয় না; যেই বলেছি গোপাল-দার ঐ বাড়ি হয়ে একটুখানি ঘুরে যাই—

বোঝা গেল, তার বাড়ি এই গ্রামেই। ছোকরাদের মধ্যে তিন-চার জন বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। বলে ঐ রকম! ভদ্দোরলোক কি না, আমাদের ওরা জানোয়ার ভাবে। পড়ে পড়ে তুই মার খেলি, জবাবটা কি আমাদের জন্য মুলতুবি রেখেছিস?

ব্যাপার তুমুল হত নিঃসন্দেহ। কিন্তু ওরই মধ্যে আধবুড়ো এক জনকে চেনা-চেনা ঠেকল। চৈতন মোড়ল না? কুশখালি এসে পড়েছি যে, বুঝতে পারি নি।

চৈতন মোড়ল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। গোঁপ-দাড়িতে ভরা আমার মুখ চিনেও চিনতে পারে না।

আমি রায়-কর্তার ছেলে গো—শঙ্কর।

'চৈতন বলে, সর্বনাশ! এদ্দিন পরে এলে? সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, মেরে থাকে মেরেছে, বেশ করেছে। ইনি মারলে দোষ হয় না, সম্পর্কে তোর খুড়শ্বশুর।

চৈতন পরিচয় করিয়ে দেয় এ হল তোমাদেরই যদু-মোড়লের জামাই। ওরে অমূল্য, পেন্নাম কর্—

অমূল্য গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! এই সময়ে এসে পড়লেন জমিদারি কাছারির নায়েব, সঙ্গে চার জন বরকন্দাজ। তিনিও এই ট্রেনে নেমেছেন, বরাবর রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন, হৈ-চৈ শুনে কি ব্যাপার জানতে এসেছেন।

কি হে? একেবারে থেমে গেলে সব? এই যে অমূল্যচন্দোরও রয়েছেন দেখছি।

যারা বেশি বীরত্ব দেখাচ্ছিল তাদের আর পাত্তা নেই, কোন্ দিকে সরে পড়েছে, যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। নজরে পড়ে গিয়ে অমূল্য ঘাড় নিচু করে রইল।

আমার দিকে চেয়ে নায়েব বললেন, জামা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। খুলুন দেখি, এঃ মশায়—

পিঠের এক জায়গায় লম্বালম্বি চিরে গেছে। সেদিকে এতক্ষণ কারও নজর পড়ে নি। একজন বরকন্দাজ ছুরিখানা কুড়িয়ে নিল।

নায়েব বোমার মতো ফেটে পড়লেন। ব্রহ্মরক্ত পাত করেছিস, ভিটেয় ঘুঘু চরাব। শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত তো হচ্ছেই ভাল করে, কাল গিয়ে ফৌজদারি চড়াব। কালাপানি ঘুরিয়ে আনব তবে আমার নাম মন্মথ শিকদার, হ্যাঁ—

আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলেন, চলে আসুন, মশায়। আমি আছি, কোন শালার উড়বার জো নেই। দায়-ঝক্কি সমস্ত আমার। চৈতন মোড়ল, বাবুর জিনিস দুটো তোমার জিম্মায় রইল, পৌছে দিও। কাছারি গিয়ে ডাক্তার ডেকে আগে তো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হোক।

রাস্তায় এসে মন্মথ মনের উল্লাস চাপতে পারেন না, হাসতে হাসতে বলেন, একটুখানি নোনছা ছাল উঠে গেছে মশায়। ডাক্তার লাগবে না হাতী ; তবে সাক্ষি হিসেবে ডাক্তার একটা চাই বটে—ডবল ফি ধরে দিলেই হয়ে যাবে, বন্দোবস্ত আছে।

চুপচাপ কয়েক পা গিয়ে আবার শুরু করলেন, ঐ অমূল্য বেটা হল পালের গোদা। আরে বাপু, মাতব্বর হবি ভাল কথা, গুছিয়ে চলতে পারলে দু-দশ টাকা আছেও, কিন্তু ঘর থেকে কিছু আগাম বের করতে হয়। সব ব্যবসার ঐ এক রীত। তোর হল ভাঁড়ে মা-ভবানী, মুটেগিরি করবি, আবার নেতাগিরিও করবি—শুধু বামুন-কায়েতদের মুণ্ডপাত করে বেড়ালে কি শেষরক্ষে হবে ?

জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে বুঝি ঐ-সমস্ত খুব আন্দোলন হচ্ছে ?

নায়েব বললেন, হবে না ? না দেবার কথা বড় মিষ্টি কি না ! সব শেয়ালের এক রা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বামুন-কায়েত ও সব কিচ্ছু নয়, নায়েব মশায়। ওদের রাগ আসলে চড়া খাজনা আর জোর-জুলুমের উপর। সেইটেই এখন জাত-বেজাতের কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

নায়েব প্রতিবাদ করে উঠলেন, সেই আহ্লাদে থাকুন মশায়। একবার আনাচ-কানাচ থেকে শুনে আসবেন দিকি ওদের কথা।

এত সব ওরা ত তলিয়ে বোঝে না !

বুঝুক না বুঝুক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। আমরা কি

ছেড়ে কথা কইব? আর তা-ও বলি, ধর্ম আছেন। নইলে দেখুন না কেন, দেওয়ানিতে আঠার মাসে বছর, আজ এক মাস ছুটোছুটি করে সমন বের করতে পারছি নে, কোত্থেকে পথের মানুষ আপনি এসে এই কাণ্ড। এর নাম ফৌজদারি মামলা, একেবারে কাঁচা-খেগো দেবতা। সকালবেলা টুক করে থানায় একখানি এজাহার ঝেড়ে দিয়ে সেকেণ্ডট্রেনে সদরে সোজা মোক্তারের বাড়ি···কি মশাই, আবার এত রাতে বাড়ি যাবেন কি করতে? কাছারিতে দুটো শাক-ভাত খেয়ে ভোর বেলা বরঞ্চ এই পথে অমনি—

সোজাই চললাম আমি। ব্যস্ত হয়ে নায়েব ডাকছেন, তা হলে সকালবেলা আসছেন তো? না, আবার লোক পাঠাতে হবে?

আমি মামলা করব না।

তার মানে?

ফিরে দাঁড়িয়ে বলি, ভেবে দেখলাম নায়েব মশায়, দোষ আমারই। পেটে ভাত নেই, শীতের রাত্রে চার মাইল মোট বয়ে আসছে—মজুরি ছ-পয়সা। এতে মেজাজ খারাপ হলে দোষ দেব কার? আমি যদি বলতাম, চার আনাই পাবি বাপু, সেইটে ন্যায্য—আর তার উপর যদি এ সব হত—

নায়েব শেষ করতে দেন না, গর্জন করে ওঠেন, তা বুঝেছি, আপনারা ঘরের ঢেঁকি সব কুমীর হয়ে উঠেছেন, তাই এই সব হাঙ্গামা।

হাঙ্গামা-হুজ্জুত না হলেই বা আপনাদের দু-পয়সা আসে কিসে? হাতবাক্স কোলে করে নেহাৎ একেবারে দুর্গানাম লিখতে কি কাছারি এসে বসেছেন? বলুন, সত্যি কি না!

চাঁদের আলোয় উঠানে বাদামতলায় এসে দাঁড়াই।

দুয়োর খোল, ও যদু—

এই উঠানে কত সন্ধ্যায় কত ছুটাছুটি করেছি, মা তখন বেঁচে। বাঁদামতলার এইখানটায় বিয়ের পর মল্লিকার পালকি এনে নামিয়েছিল। আজ যেন নূতন অতিথি, সবাই অবিশ্বাস করছে। এতকাল পরে ফিরে এসে মনে হচ্ছে, গ্রামের চেনা মানুষেরা বদলে গেছে, নূতন পৃথিবী।

যদুভাই, শুনতে পাচ্ছ না? আমি—আমি—

মল্লিকার জ্বর। লেপের নিচে এক রকম বেহুঁশ হয়ে ছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। ঠাণ্ডার ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ···মিটমিটে প্রদীপ···ভাঙাচোরা দেয়ালের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আরশুলা উড়ছে···বিশীর্ণ ভয়াবহ মুখ মল্লিকার। জ্যোৎস্না-পরিপ্লাবিত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যেন কালো গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। হাত বাড়িয়ে দিলাম মল্লিকার দিকে। জীবন এসে কি মৃত্যুকে আদর করে ডাকল?

কেমন আছ?

ভাল, খুব ভাল। এই ক'দিন একটু জ্বর হয়েছে।

ক'দিন না, ক'বছর বলো।

হোকগে। ম্যালেরিয়া জ্বর—ঐ রকম ভোগায়। মল্লিকা উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে বসে পড়ে। কি-ই বা বয়স তার, তবু চুলে পাক ধরেছে, কুঞ্চন-রেখা পড়েছে সুকোমল মুখটির উপর। সেই ছিপছিপে হাসিমুখ মেয়েটি, চোখে মুখে চঞ্চলতা—এখন কথা বলে কত আস্তে, হাঁটতে পারে না—কষ্ট হয়। বলল, মোড়ল-দাদু একা-একা কি যে করছে! আগে একটা খবর দিলে না, বেশ লোক!

বললাম, বুড়ো মনে-প্রাণে চেয়েছিলে কি না, তাই হঠাৎ ছেড়ে দিল।

চিঠিখানা পেয়ে অবধি এমন হয়েছিল মল্লিকা, খবর দেবার দেরি সইল না—ছুটে এসেছি।

এত দয়া—এমন শক্রতা আর কার আছে বলো। বলে মল্লিকা প্রগল্‌ভ হাসি হাসল।

যদু দেখা দিল, কুলোয় করে চিঁড়ে-পাটালি আর জামবাটি-ভরা দুধ এনেছে। সে থমকে দাঁড়ায়। রক্তের দাগ কেন?

মল্লিকা বলে, দেখি—এদিকে ফেরো তো।

হেসে উড়িয়ে দিই, দেখবার কি আছে? কাঁটায় ছড়ে গেছে, গরম জামায় চুপসে গিয়ে ঐ রকম দেখাচ্ছে।

আহা-হা, তাহলে আগে একটু আইডিন—

উঁহু, সকলের আগে এইটি। যদুর হাত থেকে এক রকম কেড়ে নিয়েই খেতে বসলাম। তারপর ইচ্ছে করে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই।

আচ্ছা—আমি যখন ডাকছি, গলা শুনে কি ভাবলে মল্লিকা?

মল্লিকা বলে, অনভ্যাস হয়ে গেছে ঠিক ধরতে পারি নি। ভয় হল, চোর-টোর বুঝি!

চোর এসে হাঁকাহাঁকি করে গেরস্ত জাগাচ্ছে—বুদ্ধি আছে দেখছি! হেসে উঠলাম। তারপর বলি, চোর না হই, দাগী তো বটে। বাড়ি এলাম, কিন্তু কত দিন যে থাকব—

মল্লিকা গম্ভীর হয়ে গেল। যদি বলি, যেতে দেবো না আর—বাড়ি থেকে বেরুতেই দেবো না?

এমন তো বল নি কোন দিন—

মল্লিকা বলে, তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, একটা কথাও কি গুছিয়ে বলতে পারতাম ছাই!··· সত্যি, আমি ঠিক করেছি, তোমাকে আর বাইরে-বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না।

তবে ঘরেই থাকব।

হ্যাঁ, নূতন ভাবনা আজ মনে মনে, ঘরে থাকা এখন কাজ আমাদের। কার্তিক কামার, এরফান ঘরামি, বুধো শেখ, আমাদের ঐ অমূল্য, চৈতন মোড়ল—কেউ বাদ নেই, সকলকে নিয়ে আমাদের ঘর।

খাওয়া শেষ হল। হাত ধুয়ে হাসতে হাসতে খাটের উপর এসে বসি।

মল্লিকা ঠিক বিশ্বাস করে নি। সত্যি বলছ, গ্রামে থাকবে? তা হলে তোমার দেশের কাজ?

কিন্তু এই গ্রামও কি দেশ নয়? এরা সকলে, তুমি—কে দেশের মানুষ নও, বলো।

মল্লিকা সহজভাবে নিল কথাটাকে। বলে, তা সত্যি। ধরো, তুমি তো জীবনটা এক রকম এই পথেই দিলে। আরও মানুষ রয়েছে, তারা যাক না।

ঠিক কথা। তবে যায় না যে!

হয়তো ভাবে, মিছে আত্মবলি দেওয়া। এ-জাতের কি কিছু হবে? ক'দিন থাকো দেখবে অবস্থা। দেশের ছেলেমেয়ে এতকাল এত দুঃখ স্বীকার করে কত কি করতে চেয়েছিল, সব চুরমার হয়ে গেছে।

মল্লিকার গলা ভারি হয়ে এল, সে আর এক দিকে মুখ ফেরাল। আমিও সহসা জবাব দিতে পারি নে। শেষে বললাম, পথের বাধা তো আসবেই মল্লিকা, বাধা শক্ত হচ্ছে, তাতেই তো মনে হয় সূর্য উঠল বলে। যোগী-ঋষিরা শব-সাধনা করেন, শেষ রাত্রেই ডাকিনীর উপদ্রবটা বেশি হয়। গল্প শোন নি?

মল্লিকার দিকে ব্যথাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। আবার বলি, মল্লিকা, তোমার শাঁখা সম্বল, রোগা দেহ; আমিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

সংসারের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছি—শ্মশানের উপর এবার ঘর বাঁধা হ'ল না। কিন্তু ফুল ফুটবে—এ অবশ্যম্ভাবী, আমাদের এত কষ্ট বিফলে যাবে না।

সকাল না হ'তে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়তে লাগল। যদু খিল খুলে দেখল, মানী অমূল্য চৈতন মোড়ল এবং আরও দু'তিনজন এসেছে। এরাই তাকে মারবে বলে শাসিয়ে বেড়ায়, কুশখালির দিকে যাবার উপায় নেই, জামাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পর্যন্ত পর হ'য়ে গেছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড—সেই জামাই পরম ভক্তিমান হয়ে সকলের আগে-ভাগে ঢিপ করে যদুকে প্রণাম করল, পা আর ছাড়তেই চায় না।

চৈতন বলে, লজ্জায় আসতে চাচ্ছিল না। আমি বলি, ভয় রায়কর্তার ছেলেকে নিয়ে তো নয়, এর মধ্যে শিকদার ঢুকে পড়েছে। আস্ত কলিঠাকুর—ডাহা মিথ্যের উপর চুনকাম করে। এবারে এমন জুত পেয়ে গেছে, শুধু অমূল্য কি—পাড়াটা সুদ্ধ চষে ফেলবে।

যদু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কি করেছে অমূল্য ?

খুড়োমশায় বলেন নি কিছু ? মানী কেঁদেই ফেলল। বুঝলে চৈতন-দা, এ-ও ঐ শিকদারের বুদ্ধি। বাবার কানে গেলে একটা খাতির-উপরোধের ব্যাপার হবে, একদম তাই চেপে গিয়েছেন। বেরিয়ে গেছেন নাকি ?

যদু বলে, চেঁচাস নে, ওরা ঘুমুচ্ছে ঐ ঘরে। বউঠাকরুনের রাতে ঘুম হয় না, এখন বোধ হয় একটু চোখ বুজেছে।

কিন্তু কেউ আমরা ঘুমিয়ে নেই। শুনছি।

চৈতন নিশ্বাস ফেলে বলে, তবু রক্ষে। রওনা হবার আগে খাঁসা গেছে। আর তোকেও বলি অমূল্য, পই পই করে বারণ করেছি—

গায়ে-গতরে খাটু, অধর্ম কাজগুলো ছেড়ে দে—বিশেষ, নায়েব যখন আদা-জল খেয়ে লেগেছে—

কথায় কথায় যদু সব শুনল। হঠাৎ একসঙ্গে সকলে চুপ করে যায়, নিঃশব্দে আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি তাদের মধ্যে।

রুষ্ট কণ্ঠে যদু বলে, এমন মিথ্যুক হয়েছ ভাইধন; ছুরির খোঁচা খেয়ে স্বচ্ছন্দে বললে, কাঁটায় ছড়ে গেছে!

কাঁটা নয় কি মানুষ? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলার বন্দোবস্ত হয়েছে। সমঝে চলো। শেষ পর্যন্ত কিন্তু উভয়কেই আস্তাকুড়ে যেতে হবে।

হো-হো করে হেসে উঠি।

যদু আরও জ্বলে ওঠে। হেসো না, আমার গায়ে জল-বিছুটি মারছে। হারামজাদা শেষ কালে খুনে হয়ে দাঁড়াল! যা ইচ্ছে করুক গে শিকদার, তুমিও থানায় চলে যাও ভাইধন। কিসের জামাই? জামাই বলে খাতির কোরো না।

জামাই না হোক, আমার দেশের মানুষ তো—খাতির আমাকে করতেই হবে। বলতে বলতে দুই হাতে যদুকে তুলে ধরলাম। ঝেড়ে ফেলুক সে মনের গ্লানি। বলি, বড় ভাইয়ের মতো আমায় মানুষ করলি যদু-ভাই, বাবার কাছে এতটুকু বয়স থেকে আছিস—তুই আজ ঐ কথা বললি? তোর বউঠাকরুন আঁধার ঘরে একা একা ধুঁকছে, আমারও কয়েদখানায় জীবনটা কেটে গেল—এ-সব শুধু কি নিজেদের জন্য, বামুন-কায়েতের জন্য, এই মোড়লদের জন্য নয়? যাদের চিনি নে, কোনদিন দেখব না—তারাও বড় হবে, মানুষ হবে, জীবন দিয়ে কি আমরা এই চাইনি? বল্ যদুভাই, বল্—আমি মিথ্যা বলছি কিনা!

বুড়া যদু আজকের নয়—বলতে গিয়ে যেন হাহাকার করে ওঠে।

কে ভাবে এ-সব ভাইধন? এক দল কেবল আর-এক দলকে উস্কিয়ে দিচ্ছে বই তো না! কোথাকার ভটচাজ্জিরা নতুন পাঁতি দিয়েছে—এখন থেকে তুমি আমার কেউ নও, আমি তোমার কেউ হলাম না। আজ যদি কর্তা থাকতেন!

আমরা তো আছি, মোড়ল-দাদু। তাকিয়ে দেখে সবাই শিউরে উঠল। মল্লিকা উঠে এসেছে, পা টলছে, কালি-মাখা কোটরগত দু'টি চোখে যেন আলো ফুটেছে। সামনের বেঞ্চির কোণে ধপ করে সে বসে পড়ল। বলতে লাগল, সেবারে মাটি ভাগ করেছিলে, এবার মানুষ ভাগ করেছে। সেবার সহ্য করি নি, এবারেও করব না। বসো তোমরা, মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে। নিমু ময়রার দোকানে একটিবার যেতে পারবে মোড়ল-দাদু?

খানিক পরে আবার মল্লিকা বেরিয়ে এল, হাতে হলদে সুতো। বলে, আমার শ্বশুর এ-সব তুলে রেখে গিয়েছিলেন। এস তোমরা, পরতে হবে। তুমি এস...তুমি···তুমি···

অমূল্য কেবল মুখ ভারি করে থাকে। বলে, আমার হাতখানা মুচড়ে, একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে, এই হাতে পরব রাখি?

আমি বললাম কি করি—শুধু হাতখানাই হাতের মাথায় পেলাম যে! মনের নাগাল পাই নে, নইলে মনটাই মুচড়ে ভেঙে দিতাম।

মানুষের মন ছাপিয়ে বিষ উপচে পড়ছে আজ চারিদিকে। কালরাত্রির প্রহর গুণছি; সামনে নির্মল প্রভাত। সমস্ত গ্লানি ঘুচে যাবে তখন।

কুশখালির চাষীদের মধ্যে আজকাল আমার খুব যাতায়াত। তাই নিয়ে নানাজনে নানা টিপ্পনী কাটে।

দারোগা বলে, এবারে সায়েস্তা হয়ে এসেছেন শঙ্করবাবু। চুলে পাক ধরছে কিনা, আর কত দিন? তা ভালো, পথটা নির্ঝঞ্ঝাট—

রাজ্যেশ্বর নামে গ্রামে এক তালুকদার আছেন, সম্পর্কে তিনি আমার খুড়ো। হঠাৎ কেন জানি না, বড় সদয় হলেন আমার উপর; একদিন তিনি ডেকে বললেন, কলকাতায় গিয়ে একটা কিছু বাগিয়ে বসো দিকি বাবাজীবন, তবে বলব বাহাদুর। সাহেবদের বলো, একটা ভাল চাকরি দিন স্যার, নইলে আবার ডবল করে স্বদেশীতে লেগে যাবো কিন্তু। এতখানি বয়স ধরে দেখছি, কত লোক গুছিয়ে নিল এই সব করে। তুমিই বা কেন ছাড়বে?

আর ঐ নায়েব মন্মথ শিকদার বলেন, চাষীপাড়ায় ঘুরে ঘুরে আমরা জমিদারের খাজনার তাগিদ দিই, কলাটা-মুলোটা আদায় করি। আপনি যে অহরহ ঘুরছেন মশায়, আপনাদের ভারত-মাতার স্বাধীনতাও আদায় হবে কি ঐ পাড়া থেকে?

হ্যাঁ ভাই, আসল ঘাঁটি ধরেছি। সত্যিকার স্বাধীনতাই আনব আমরা গ্রামে শহরে—সকলের মধ্যে; মিথ্যে ভয় থেকে স্বাধীনতা, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বাধীনতা, মানুষের মতো বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা। রাজ্যেশ্বর কোম্পানীকে এসেম্বলিতে পাঠিয়ে ইংরেজদের বিপক্ষে কড়া কড়া বক্তৃতা করানো, আর তাঁর আত্মীয়পরিজনদের জন্য ভাল ভাল কতকগুলো চাকরি বাগানোর স্বাধীনতা নয়।

শোন, শোন, আমার সেই স্বাধীন সুখী ধরিত্রীর স্বপ্ন। মানুষে মানুষে বিরোধ নিঃশেষ হয়েছে, শোষক শোষিত হাত মিলিয়েছে, জনে জনের মুখে হাসি, চিরদিনের পঙ্গু উঠে বসেছে—ঐ দেখ। প্রাণে তাদের আশার বিদ্যুৎ।

গরু ও মানুষ ছিল প্রায় এক ধরণের; প্রহার-পীড়নে মাথা তুলত

না—নিঃশব্দে সয়ে যেত, অসহ্য হলে মুখ থুবড়ে পড়ত। জীবনের উন্মাদনা জেগেছে সেইসব মানুষের মধ্যে, মুখ তুলে উল্লাসে তারা ঐশ্বর্যবতী ধরণীর দিকে চাইছে।

মল্লিকা তর্ক তোলে, এই ধরো আমাদের যদু। টাকার তো সে কামনা করে না। দরিদ্র-জীবনই তার কাছে ভাল—

ভাল তো অনেকেরই কাছে। দারিদ্র্যের গর্ব নিয়ে নিঃশব্দে মরতে পারে।

মল্লিকা বলে, কিন্তু অমূল্যের পাশাপাশি তাকে দেখ। কত শান্তি মোড়ল-দাদুর জীবনে!

জীবন নয়, ওটা মৃত্যু। মৃত্যুর মতো শান্ত কি কিছু আছে!

কিন্তু সবাই ভোগের প্রত্যাশী হলে জগতের হানাহানি কি বেড়ে যাবে না?

না মল্লিকা, না। ধরণী কৃপণ নয়, অনন্ত তার সম্পদ। মানুষের প্রয়োজন মতো খাবার আছে, সকলের থাকবার জায়গাও আছে—নেই কেবল মানুষের লোভের জায়গা।

যেন বাতাসে বাতাসে শোনা যাচ্ছে, দিন আসছে ঐ। সব সমান···আলো-হাওয়া, পৃথিবীর বুকের রসে সিঞ্চিত শস্য-সম্পদ, গোপন মণিকোঠায় রেখে-দেওয়া কয়লা-ইস্পাত একলা কারো নয়। মেরে মেরে একের হাত চোস্ত হয়ে গেছে, আর একজনেরও মার না খেলে পিঠ উসখুস করে—এ অবিচারের শেষ হয়ে এল। বিরোধ অপ্রীতি দূর হয়ে যাবে। শান্তি আসবে, শ্রী ফিরবে। বিবাদের মধ্যে কত অন্যায় করেছি! রক্তপাত হয়েছে, আপন-পর কত লোকের চোখের জল ঝরেছে! নূতন দিনে কারও এসব মনে থাকবে না। প্রভাতের আলোয় রাত্রির দুঃস্বপ্ন ভুলে যাব ভাই—